ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

চতুর্থ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

উত্তরণের উপায়

চতুর্থ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ সংকলন)

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
এম হাফিজউদ্দিন খান, সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
ড. এ টি এম শামসুল হুদা, সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ : মোঃ বরকত উল্লাহ বাবু, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), পুরাতন ২৭
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-34-0188-5

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় **৯-১৩৬**
জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

টীকা ৯

পার্লামেন্টওয়াচ : দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৪) ১৩
মোরশেদা আক্তার ও জুলিয়েট রোজেটি

পার্লামেন্টওয়াচ : নবম জাতীয় সংসদ (জানুয়ারি ২০০৯-নভেম্বর ২০১৩) ২৯
মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা : সমস্যা ও উত্তরণের উপায় ৪৯
ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা ৫৯
শাহজাদা এম আকরাম

বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা : প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা ৭২
রুমানা শারমিন ও জুলিয়েট রোজেটি

কার্যকর নির্বাচন কমিশন : অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৮৪
সাধন কুমার দাস ও শাহজাদা এম আকরাম

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০১৫ : প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ৯৫
মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও তাসলিমা আক্তার

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : উত্তরণের উপায় ১০৩
দিপু রায়

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১১৬
দিপু রায়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল : বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ১২৭
শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩৯-১৬৯
আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান

গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১২ : বাংলাদেশ প্রতিবেদন ১৩৯
মো. শাহ্নূর রহমান ও মোহাম্মদ নূরে আলম

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ১৫৫
শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস

লেখক পরিচিতি ১৭০

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও এর ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক তিনটি সংকলন ইতিমধ্যে ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ সংকলন ২০১৬ সালের একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। বিষয় অনুসারে এ সংকলনটি দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণার সার-সংক্ষেপ স্থান পেয়েছে। এ অধ্যায়ে রয়েছে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর পর্যবেক্ষণ এবং নবম জাতীয় সংসদের সবগুলো (প্রথম থেকে উনিশতম) অধিবেশনের ওপর পর্যবেক্ষণ নিয়ে পার্লামেন্টওয়াচ, বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা এবং নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা নিয়ে সম্পন্ন গবেষণার সারাংশ। এ অধ্যায়ে আরও রয়েছে বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার প্রক্রিয়া ও কাঠামো নিয়ে টিআইবির প্রস্তাবনা, নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় এবং ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০১৫-এর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ নিয়ে গবেষণার সার-সংক্ষেপ। এ ছাড়া রয়েছে হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় নিয়ে গবেষণার সার-সংক্ষেপ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনামূলক গবেষণার সারাংশ।

সংকলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান নিয়ে সম্পন্ন গবেষণার সংক্ষিপ্তসার। এর মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১২-এর বাংলাদেশ প্রতিবেদনের সারাংশ এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

এই সংকলনটি প্রকাশ করতে টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সহকর্মীরা সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়েছেন। সংকলন গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রকাশনা-সংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। টিআইবির সব গবেষণার উপদেষ্টা হিসেবে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিশেষ করে বোর্ডের সাবেক চেয়ারপারসন এম হাফিজউদ্দিন খান এবং বর্তমান চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের অমূল্য অবদানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ, সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদানকারীসহ সকল অংশীজন যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

টীকা

স্পিকার : স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী : মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য : সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বোঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য : বেসরকারি সদস্য অর্থ কোনো মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য।

কার্যপ্রণালিবিধি : কার্যপ্রণালিবিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন : অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন থেকে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা, যা কার্য উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক : বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপকমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান : এতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন : বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ : এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদে কার্যবহি থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় : অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে যে ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে, তা বহির্ভূত অন্য কোনো ইস্যু।

দলীয় প্রশংসা : দলীয় প্রশংসা বলতে কোনো কারণ ছাড়াই দলের সাবেক বা বর্তমান নেতা বা নেত্রীর বা দলের প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা : এই প্রতিবেদনে সমালোচনা বলতে সংসদ সদস্য যে বিষয়ে কথা বলছেন, সেই বিষয়ের সাথে সংগতি নেই বা বিরোধীদের প্রসঙ্গ টানার দরকার না থাকা সত্ত্বেও তা করেন এবং প্রতিপক্ষ দলের সাবেক নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন : কার্যপ্রণালিবিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া : আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে ‘বিল’ বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (১) সরকারি বিল- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল- মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের আগে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই, কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক সম্মতিদানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব : সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে এক দিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধু বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রতি বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন, সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্য সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালিবিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোনো সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা : কার্যপ্রণালিবিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এ-সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোনো জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিশের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশ : জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি ৬৮ অনুযায়ী কোনো জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোনো সদস্য অন্যূন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন দুদিন আগে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

৭১(১)-এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিশ থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিশ গ্রহণ করতেও পারেন আবার না-ও করতে পারেন। যেসব নোটিশ গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দিতে পারেন।

উপরিউক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধু সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে ওই সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব, ততজনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব : কার্যপ্রণালিবিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালিবিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিশের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। আবার ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিশের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি, বিধি ৪১

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি, বিধি ৪১।

অনির্ধারিত আলোচনা : কার্যপ্রণালিবিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য ওই সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোনো বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার : কার্যপ্রণালিবিধি ২৭০-এর ৪, ৫ ও ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় রহিত করার প্রস্তাব ছাড়া সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষ কিংবা সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

কোরাম-সংকট : সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিতিকে কোরাম বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশনকক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠনপ্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা : কার্যপ্রণালিবিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো– কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের কাছে থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।

[৩] বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭৬।

পার্লামেন্টওয়াচ
দশম জাতীয় সংসদ : প্রথম অধিবেশন (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৪)*

মোরশেদা আক্তার ও জুলিয়েট রোজেটি

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব-পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকেন।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহির সংস্কৃতিচর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে চারটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬]

প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

---

* ২০১৪ সালের ৭ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

৫ জবাবদিহির অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র : Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics,* New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা : জনগণের প্রত্যাশা*, ২০০৮।

৬ অষ্টম জতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকাবিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ।
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ।
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ।
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ করা।

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা-পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম-সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ-সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি-সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণসংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

১.৪ গবেষণার সময়

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল ২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলি

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকি ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী

সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৭] সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৯৪ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৬ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ ও ২০ ভাগ। হলফনামায় উল্লিখিত প্রধান পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ৫৯ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইনজীবী শতকরা ১৩ ভাগ। দশম সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ সদস্য স্নাতক এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ দশমিক ৬ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের।

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার বেশি থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে দশম সংসদে ১৩ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৮ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দশম সংসদে তা ৫৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে (চিত্র : ২.২)।

চিত্র : ১ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)।

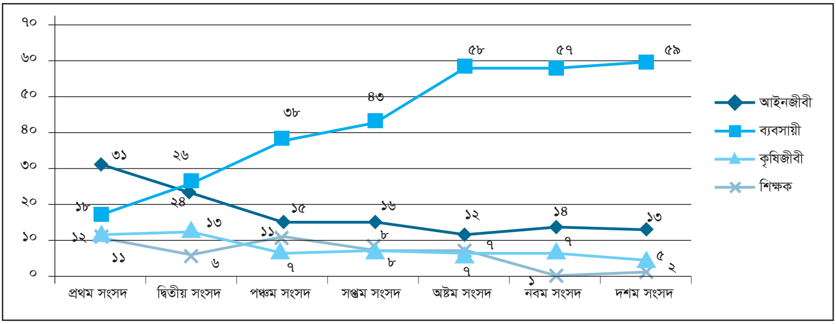

৩. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৩.১ দশম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় :

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ৩৬ দিন (২৯ জানুয়ারি-১০ এপ্রিল ২০১৪), ব্যয়িত মোট সময় ১১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘণ্টা ৯ মিনিট। সবচেয়ে বেশি ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এ ছাড়া আইন প্রণয়নে ১ দশমিক ৮ শতাংশ, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশি ২২ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে মোট সময়ের ৮ শতাংশ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ২৭ শতাংশ কোনো বিষয়সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৪ শতাংশ প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে এবং রাজ্যসভায় মোট সময়ের ৮ শতাংশ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ৫১ শতাংশ কোনো বিষয়সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৬ শতাংশ প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করা হয়।[৮]

---

[৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[৮] www.prsindia.org, viewed on 22 June 2014

চিত্র ২ : প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার।

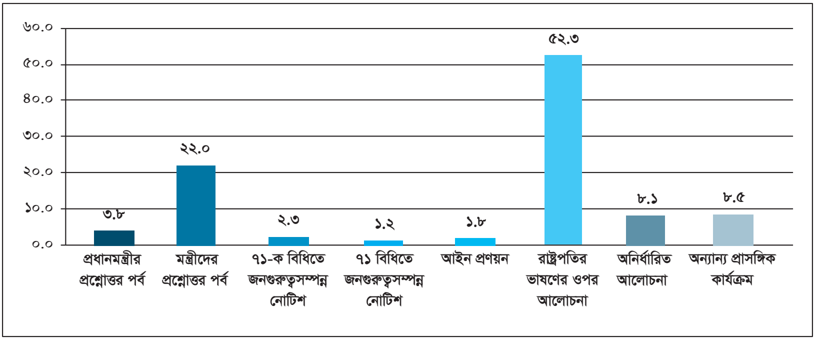

৩.২ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি

সার্বিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলেন ২২৪ জন, যা মোট সদস্যের ৬৪ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২৩ শতাংশ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ৭ শতাংশ সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের তিনজন[৯] এবং স্বতন্ত্র একজন[১০] সদস্য প্রথম অধিবেশনের ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৬ কার্যদিবসে (১০০ শতাংশ) সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২১ দশমিক ৮ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে ৫০ শতাংশ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে মোট ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৩২ দিন (প্রায় ৮৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১৪ দিন (প্রায় ৩৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশি উপস্থিত ছিলেন।

৩.৩ সংসদ বর্জন

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি।

৩.৪ ওয়াকআউট

প্রথম অধিবেশনে কার্যদিবসগুলোর মধ্যে একটি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দল একবার ওয়াকআউট করে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে।

---

[৯] গাইবান্ধা-৫ (মো. ফজলে রাব্বী মিয়া), নওগাঁ-২ (মো. শহীদুজ্জামান সরকার), ঢাকা-১৬ (মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা)।

[১০] নরসিংদী-২ (কামরুল আশরাফ খান)।

৩.৫ কোরাম-সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশনকক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম-সংকট হয়। প্রথম অধিবেশনে মোট ১৭ ঘণ্টা ৭ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজের বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম-সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[১১] এই হিসাবে প্রথম অধিবেশনে কোরাম-সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৮ কোটি ১ লাখ ৬ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।

চিত্র ৩ : অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের অধিবেশনের গড় কোরাম-সংকট (মিনিট)।

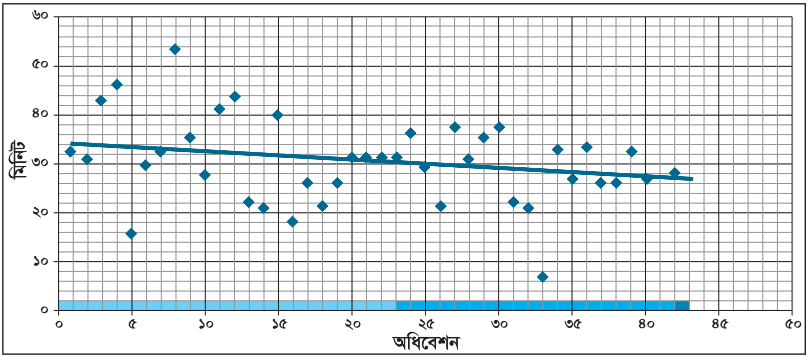

প্রতি অধিবেশনে গড় কোরাম-সংকট অষ্টম সংসদে ছিল ৩৭ মিনিট (সর্বোচ্চ ৫৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ১৬ মিনিট) এবং নবম সংসদে ৩২ মিনিট (সর্বোচ্চ ৪৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ৭ মিনিট)। অষ্টম সংসদ থেকে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের গড় কোরাম-সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হলেও এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

[১১] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা-সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লাখ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩ দশমিক ৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কোরাম-সংকটের মোট অর্থমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরও কিছু সেবা খাত রয়েছে, যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় ওই বছরের তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

৩.৬ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

প্রথম অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট সময় ব্যয় করা হয়, যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৩ সালে ভারতে[১২] ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় হাউসে ৮ শতাংশ সময় আইন প্রণয়নে ব্যয় করা হয়।

প্রথম অধিবেশনে মাত্র দুটি সরকারি বিল পাস করা হয়। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৬ মিনিট। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে কোনো সদস্য অংশগ্রহণ করেননি। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল-সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা প্রায় ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ব্যয় করেন। ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে ২৩ শতাংশ বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ৩ ঘণ্টার অধিক সময় আলোচনা করতে দেখা যায়।[১৩]

স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর দুটি সরকারি বিল সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়, মোট ছয়টি বেসরকারি বিলের নোটিশ দেওয়া হলেও সংসদে উত্থাপিত হয়নি। উল্লেখ্য, কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সংসদের অমীমাংসিত কোনো সিদ্ধান্ত নবনির্বাচিত সংসদে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। তাই নবম সংসদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের সুপারিশ করা হলেও দশম সংসদে বিলগুলো চূড়ান্ত অনুমোদনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

'সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি বিল, ২০১০', যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি। দশম সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারি নির্বাচনী ইশতেহারে এ-সম্পর্কিত অঙ্গীকার থাকলেও প্রথম অধিবেশনে এ বিলটি পাসের কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি।

৩.৭ সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি

সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সদস্যদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিশ উপস্থাপন, জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৫৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না-কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১৮ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ ছয়টি পর্বে অংশ নিয়েছেন প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য। সর্বনিম্ন একটি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৮৪ জন। মোট ১৯১ জন সদস্য (৫৪ দশমিক ৬ শতাংশ) কোনো পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

---

[১২] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*

[১৩] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*

৩.৭.১ *প্রশ্নোত্তর পর্ব*

প্রধানমন্ত্রী মোট ছয়টি কার্যদিবস সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২২ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ১৬ জন সরকারি, দলের একজন প্রধান বিরোধী দলের এবং পাঁচজন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে–বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন শিল্প স্থাপন, সুষ্ঠু উপজেলা নির্বাচনের দিকনির্দেশনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিধি, তৈরি পোশাকশিল্পের সহযোগী উপকরণ তৈরির জন্য শিল্পকারখানা নির্মাণ, জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পদক্ষেপ, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৩৭ জন সংসদ সদস্য মোট ১৪৭টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৪৬টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১০৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। সংসদ সদস্যরা মোট ৩৬টি মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশি (৫৯টি) এবং অর্থ (৫৩টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৫০টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ (৪৪টি) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অন্যান্য ৩২টি মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।

৩.৭.২ *সিদ্ধান্ত প্রস্তাব*

বিধি ১৩১ অনুযায়ী উত্থাপিত ও আলোচিত মোট আটটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে সবগুলো প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। বিষয়গুলোর মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরোনো রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রস্তাবকারী সদস্যদের যেসব ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন, তাতে বলা হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীকালে পদক্ষেপ নেওয়া হবে–এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান।

৩.৭.৩ *জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ*

প্রথম অধিবেশনে কার্যপ্রণালিবিধি ৭১-এ মোট ১৭৪টি নোটিশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে ১২৭টি সরকারি দলের, ১৯টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২৮টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের। এর মধ্যে ১৫টি নোটিশ আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিশগুলোর মধ্যে নয়টি সরকারি দলের, চারটি প্রধান বিরোধী দলের এবং দুটি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। নোটিশের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চসংখ্যক নোটিশ (তিনটি) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত।

উপস্থাপিত নোটিশের মধ্যে যেসব নোটিশ গ্রহণ করা হয়নি এর মধ্যে মোট ৭১টির ওপর ৫৮ জন সদস্য প্রায় ২ ঘণ্টা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে সরকারি দলের ৪৫ জন সদস্য ৫৩টি, প্রধান বিরোধী দলের তিনজন সদস্য পাঁচটি ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১০ জন সদস্য ১৩টি নোটিশ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত নোটিশের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (১২টি)।

৩.৭.৪ *মুলতবি প্রস্তাব*

একজন স্বতন্ত্র সদস্য বিধি ৬২ অনুযায়ী পাঁচটি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ দেন। নোটিশের বিষয়গুলো :

- ঢাকার সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে দিনে অর্ধকোটি টাকার চাঁদাবাজি।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে বছরে ২৯ কোটি টাকার তেল চুরি।
- মেঘনায় অবাধে চলছে জাটকা শিকার।
- রংপুর মেডিকেল কলেজে দুই বছরে দেড় কোটি টাকার ওষুধ চুরি।
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর–দুর্নীতির দুর্গ।

নোটিশের বিষয় কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী অন্য বিধিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হওয়ায় স্পিকার নোটিশগুলো বাতিল ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশের বিষয়গুলো নিয়ে অন্য কোনো পর্বেও আলোচনা হয়নি।

৩.৭.৫ *অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার*

প্রথম অধিবেশনে মোট ২৩টি কার্যদিবসে প্রায় ৯ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ব্যয়িত হয়, যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ২৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১৯, প্রধান বিরোধী দলের ছয় ও অন্যান্য বিরোধী চারজন) প্রায় ৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৪০টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে সাবেক প্রধান বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের সমালোচনা, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ-এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। তবে জাতীয় ইস্যু, আন্তর্জাতিক চুক্তি-এ বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান বিরোধী দল কোনো অবস্থান নেয়নি। উল্লেখ্য, অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র সদস্য প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদে সহাবস্থানকে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করেন।

৩.৭.৬ *জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়গুলো উত্থাপিত না হওয়া*

প্রথম অধিবেশন চলাকালীন কিছু ঘটনা এবং বিষয় বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট ফোরামে আলোচিত হলেও সংসদে কোনো দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য, কার্যপ্রণালি বিধি ৬৮, ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী

জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ সংসদ সদস্যদের রয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের উত্থাপন করেনি। যেমন- বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস[১৪], মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরিতে জালিয়াতি [১৫], উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য[১৬], চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ[১৭], হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যদের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ[১৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩.৭.৭ *জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি*

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো কমিটি (৫১টি) গঠন করা হলেও, কমিটিতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথম অধিবেশনে ৪৩টি কমিটি মোট ৬৫টি বৈঠক করে। এর মধ্যে ২৩টি কমিটি একটি করে, ১৮টি কমিটি দুটি করে এবং দুটি কমিটি তিনটি করে বৈঠক করে। দশম সংসদ গঠনের পর থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটি ও আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ তিনটি করে বৈঠক করে। আটটি কমিটি কোনো বৈঠক করেনি।

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি-সম্পর্কিত ৪৩টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৭৮ শতাংশ। কৃষি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশি (১০০ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব-সম্পর্কিত কমিটিতে ৬০ শতাংশ।

সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির (সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলপত্র দাখিল) আইন-২০১১' নামে একটি বিলের খসড়া তৈরি করলেও তা দীর্ঘদিন ধরে হিমাগারে পড়ে আছে। বিদায়ী নবম সংসদে বিলটি উত্থাপন ও পাস হওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তা হয়নি। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেও বিলটি উত্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সদস্যদের এ ধরনের সম্পৃক্ততা নবম সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি করেছে[১৯]।

---

[১৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪

[১৫] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪

[১৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[১৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[১৯] দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৪

৩.৭.৮ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ২২৮ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৫৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বক্তব্য রাখেন, যা মোট সময়ের ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৬৫, প্রধান বিরোধী দলের ৩০ ও অন্যান্য বিরোধী দলের ৩৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলো রাজনৈতিকীকরণ করে সাবেক বিরোধী দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করে। তাদের নির্বাচনী এলাকা-সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, নবম সংসদের বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা প্রাধান্য এ পর্বে উল্লেখযোগ্য।

সংসদ নেতার বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা, কৃষি, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসেবা খাত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, রাস্তাঘাট, পুল ও সেতু উন্নয়নের চিত্র ইত্যাদি। বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্যে ভেজাল ও নদীদূষণ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান, স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক না করার অনুরোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের ব্যবস্থা, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

সারণি ১ : অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২২ (৬.৩%)	১৬ (৪.৬%)	১ (০.৩%)	৫ (১.৪%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৩৭ (৩৯.১%)	১০৭ (৩০.৬%)	১৬ (৪.৬%)	১৪ (৪%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১৭ (৪.৯%)	১৩ (৩.৭%)	১ (০.৩%)	৩ (০.৯%)
অনির্ধারিত আলোচনা	২৯ (৮.৩%)	১৯ (৫.৪%)	৬ (১.৭%)	৪ (১.১%)
জনগুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	৮ (২.৩%)	৪ (১.১%)	৩ (০.৯%)	১ (০.৩%)
জনগুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	৫৮ (১৬.৬%)	৪৫ (১২.৯%)	৩ (০.৯%)	১০ (২.৯%)
আইন প্রণয়ন	৮ (২.৩%) (মন্ত্রী)	৮		
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২২৮ (৬৫.১%)	১৬৫ (৪৭.১%)	৩০ (৮.৬%)	৩৩ (৯.৪%)

* ৮৩ জন সদস্য কোনো পর্বে অংশ নেননি (সরকারি দলের ৭৪, প্রধান বিরোধী দলের আট ও অন্যান্য বিরোধী দলের একজন)

৩.৮ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

দশম সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আটজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ দশম সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা ৬৯ জন। উল্লেখ্য, সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩৯, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ছয়, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি এক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এক ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তিনটি আসন পান। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদে চারজন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর এবং ৩১ শতাংশ স্নাতক পর্যায়ের। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ২৯ ভাগ নারী সদস্য ব্যবসায়ী, ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ আইনবিদ, ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ রাজনীতিক, ৭ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষক।

প্রথম অধিবেশনে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ২৬ থেকে ৫০ শতাংশ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ছয়জন নারী সংসদ সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) ১২টি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যাদের মধ্যে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কোনো দলের কোনো সদস্যের অংশগ্রহণ ছিল না। ৭১-ক বিধিতে একজন সরকারদলীয় নারী সদস্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য কর্তৃক দুটি নোটিশ (একটি সরকারি, একটি প্রধান বিরোধী) দেওয়া হলেও আলোচনার জন্য একটিও গৃহীত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৫১ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১২ জন সরাসরি নির্বাচিত (দুজন প্রধান বিরোধী দলের), সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে তিনজন প্রধান বিরোধী দলের এবং তিনজন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য। এ ছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় দুজন সরকারি দলের নারী সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) অংশ নেন।

মোট ৫১টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৫০টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য রয়েছেন, যাদের মধ্যে ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। একটি কমিটিতে (সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত) কোনো নারী সদস্য নেই। এ ছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে পাঁচজন নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন (চারটি কমিটিতে স্পিকার, চারটি কমিটিতে চারজন সরকারি দলের সদস্য)।

৩.৯ স্পিকারের ভূমিকা

প্রথম অধিবেশনে স্পিকার ৭৭ ঘণ্টা ৩১ মিনিট (৬৮ শতাংশ), ডেপুটি স্পিকার ৩৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (৩০ শতাংশ) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (২ শতাংশ) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের ওপর রুলিং প্রদান করেননি। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকারদলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ করা যায়।

৪. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- প্রথম অধিবেশনেই সব সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।
- অষ্টম ও নবম সংসদের অধিবেশনগুলোর সাপেক্ষে গড় কোরাম-সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি।

নেতিবাচক দিক :

- দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ৬৪ শতাংশ (নবম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৬৮ শতাংশ)।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী প্রস্তাব ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব- কোনো ক্ষেত্রেই সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল না।
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকার কোনো রুলিং দেননি।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল থেকে কোনো সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণবিধি প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- প্রধান বিরোধী দলসহ কোনো সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত না হওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় :
  - ✓ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস।
  - ✓ মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরিতে জালিয়াতি।
  - ✓ উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য।
  - ✓ চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ।

✓ হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ।

- মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রধান বিরোধী দল উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির অবস্থানের কারণে দশম সংসদ ব্যতিক্রমী পরিচিতি লাভ করেছে।

সারণি ২ : নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	দশম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২ শতাংশ সদস্য সরকারি ও ২৮ শতাংশ সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮ শতাংশ সদস্য সরকারি ও ১২ শতাংশ সদস্য বিরোধী দলের।	৮১ শতাংশ সদস্য সরকারি ও ১৯ শতাংশ সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	কার্যদিবস ছিল ১৯ এবং ওই কার্যবিদসে মোট প্রায় ৫৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ৪ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৯ এবং ওই কার্যবিদসে মোট প্রায় ১৪৫ ঘণ্টা ২২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৬ ও ওই কার্যদিবসে মোট প্রায় ১১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ৯ মিনিট।
কোরাম-সংকট	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম-সংকট ছিল গড়ে ৩৪ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম-সংকট ছিল গড়ে ৩৮ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম-সংকট ছিল গড়ে ২৮ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	-*	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৮ শতাংশ।	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৪ শতাংশ।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	-*	৭৬ দশমিক ৯২ শতাংশ কার্যদিবস (৩০ কার্যদিবস)।	৮৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ কার্যদিবস (৩২ কার্যদিবস)।
বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতি	শূন্য শতাংশ কার্যদিবস।	৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ কার্যদিবস (৩ কার্যদিবস)।	৩৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ কার্যদিবস (১৪ কার্যদিবস)।
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ৪৮টি, যার সবগুলো সরকারি দলের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ২৩৭টি, যার মধ্যে সরকারি ও বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ২১৮ ও ১৯টি।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে ১৪৭টি মূল প্রশ্ন ছিল মোট যার মধ্যে সরকারি ও বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ১২১ ও ২৬টি।
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত নোটিশ	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ, অন্যান্য বিরোধী দলের ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ নোটিশ গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ, বিরোধী দলের ১১ দশমিক ১ শতাংশ নোটিশ গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ, বিরোধী দলের ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ নোটিশ গৃহীত হয়।
বিল পাস	পাঁচটি বিল পাস হয়।	৩২টি বিল পাস হয়। উল্লেখ্য তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংসদে অনুমোদন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় বিলের সংখ্যা বেশি।	দুটি বিল পাস হয়।
সংসদীয় কমিটি গঠন	প্রথম অধিবেশনে পাঁচটি কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি ।	প্রথম অধিবেশনেই সব কমিটি গঠিত, তিনটি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।	প্রথম অধিবেশনেই সব কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি।

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	দশম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)
সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউট	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ বর্জন করে। কোনো ওয়াকআউট হয়নি।	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবসে যোগদান করলেও পরবর্তী সময়ে আসনবিন্যাসকে কেন্দ্র করে ১৭ কার্যদিবস (৪৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ) সংসদ বর্জন করে। প্রধান বিরোধী দল ছয়বার ওয়াকআউট করে।	প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি। প্রধান বিরোধী দল একবার ওয়াকআউট করে।
অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যা মোট সময়ের প্রায় ৪ দশমিক ৮ শতাংশ।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যা মোট সময়ের প্রায় ৩ দশমিক ৭ শতাংশ।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৯ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যা মোট সময়ের প্রায় ৮ শতাংশ।
দলীয় প্রশংসা	-*	নিজ দলের প্রশংসা ২৫১ বার	নিজ দলের প্রশংসা ৮৫৬ বার
সমালোচনা	-*	সরকার ও বিরোধী দল একপক্ষ প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা করে ৩৪২ বার।	সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে সাবেক বিরোধী দলের সমালোচনা করে ৫৩১ বার।
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন	-*	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ৫০৩ বার উত্থাপন করা হয়।	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ১৫৯ বার উত্থাপন করা হয়।
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধীপক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয়-সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	সময় নিয়ন্ত্রণ করার চর্চা উৎসাহিত করায় নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হ্রাস পায়। তবে আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয়-সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	দশম সংসদেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। তবে বিরোধীপক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি ও বিরোধী দলকে সাবেক বিরোধী দলের সমালোচনা করতে দেখা যায়।
স্পিকারের ভূমিকা	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৮৬ বার সদস্যদের তাড়া দেন এবং ১৫ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৭৩৩ বার সদস্যদের তাড়া দেন এবং ৪৬ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০ বার সদস্যদের তাড়া দেন এবং ১২ বার মাইক বন্ধ করে দেন।

* তথ্য পাওয়া যায়নি

৫. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবির সুপারিশ

৫.১ স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য :

৫.১.১ সদস্যদের উপস্থিতি-সংক্রান্ত

১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

২. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন- এরকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫.১.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত

৩. নবম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ‘সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০’ চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.১.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময়-সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

৬. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

৫.১.৪ তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত

৭. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মতো ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথাসময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সব গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে ।

৫.১.৫ সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত

৯. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৫.১.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১০. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য বা আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে, এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১১. কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে, এ ব্যাপারে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ওই সদস্য মন্ত্রী হলে তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন- এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

৫.২ দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

৫.২.১ সদস্যদের উপস্থিতি-সংক্রান্ত

১. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ-সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

৫.২.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত :

৩. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্য যেকোনো বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরির জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৫. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.২.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময়-সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

৫.২.৪ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

৭. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা : জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।

ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।

ফজল, আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।

ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে : বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।

মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৪।

পার্লামেন্টওয়াচ : নবম জাতীয় সংসদ (জানুয়ারি ২০০৯-নভেম্বর ২০১৩)*

মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজ প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকেন।[২০] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহির সংস্কৃতিচর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে নয়টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[২১] এ প্রতিবেদনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে নবম সংসদের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

---

* ২০১৪ সালের ১৮ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

২০ জবাবদিহির অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র : Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics,* New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা : জনগণের প্রত্যাশা,* অক্টোবর ২০০৮।

২১ অষ্টম জতীয় সংসদের প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২২ আগস্ট, ২০০২ তারিখে। দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২ মে, ২০০৩ তারিখে। তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩। চতুর্থ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১ মার্চ, ২০০৫। পঞ্চম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২৭ জুন, ২০০৬। ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখে। নবম সংসদের প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯ তারিখে, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১ এবং তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ প্রকাশিত হয়েছে ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- সামগ্রিকভাবে নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা।
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ।
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ।
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ ও
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ করা।

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণাপদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম-সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ-সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি-সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ-সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

১.৪ গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০০৯-নভেম্বর ২০১৩ সময়কালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সর্বশেষ (ঊনবিংশতিতম) অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. নবম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলি

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও শরিক দল ৮৮, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও শরিক দল ১১ ও অন্যান্য দল ১ শতাংশ আসনে নির্বাচিত হয়। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৯৩ শতাংশ পুরুষ এবং ৭ শতাংশ নারী। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৮০ ও ২০ শতাংশ। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন;

অন্যদিকে ৭ শতাংশ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার কম পর্যায়ের।[২২] সংসদ সদস্যদের পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সার্বিকভাবে ৫৭ শতাংশ সদস্যের প্রধান পেশা ব্যবসা।[২৩]

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার বেশি থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে নবম সংসদে ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৭.৫ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে নবম সংসদে শতকরা ৫৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে (চিত্র : ১)।

চিত্র : ১ নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

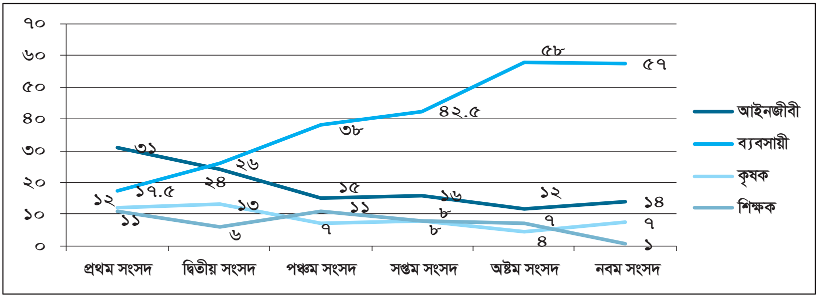

৩. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৩.১ নবম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

নবম সংসদে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ দিন। বছরে গড় কার্যদিবস ৮৪ দিন। সবচেয়ে বেশি কার্যদিবস (৮৮ দিন) ছিল ২০১০ সালে এবং সবচেয়ে কম (৮০ দিন) ছিল ২০১১ সালে। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে ২০১২-১৩ সালে মোট কার্যদিবস ছিল ১৪৩ দিন এবং বছরে গড়ে ১৪০ কার্যদিবস।[২৪] ভারতে ২০১১ সালে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় আইনসভাতে বছরে গড়ে ৭৩ কার্যদিবস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[২৫] এ ১৯টি অধিবেশনের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ১৩৩১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট।[২৬]

২২ সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য (সূত্র : *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮)।

২৩ ড. আবুল ফজল হক, *The Ninth Parliament Election: A Socio-political Analysis,* ২০০৯।

২৪ www.publications.parliament.uk

২৫ http://ibnlive.in.com/news/indian-parliament-at-60-years-facts--statistics viewed on 13 March 2014

২৬ যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৮ ঘণ্টা এবং ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘণ্টা সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ২ : প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

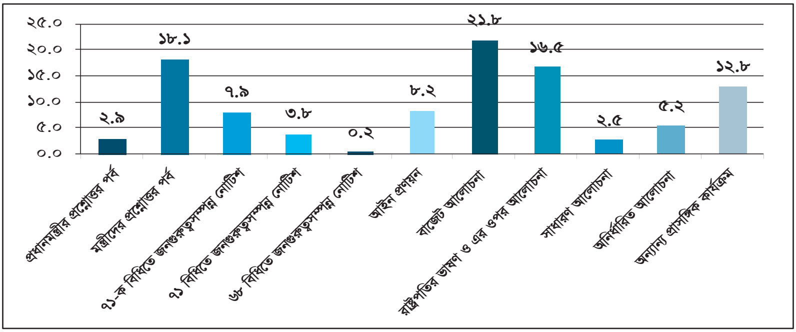

সবচেয়ে বেশি ২১ দশমিক ৮ শতাংশ বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এ ছাড়া আইন প্রণয়নে ৮ দশমিক ২ শতাংশ, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশি ১৮ দশমিক ১ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়।[২৭]

৩.২ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি

সার্বিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলেন ২২১ জন, যা মোট সদস্যের ৬৩ শতাংশ। সার্বিকভাবে ৪১ শতাংশ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ১৪ শতাংশ সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৪৬ দশমিক ৯ শতাংশ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের একজন[২৮] সদস্য নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৪১৭ কার্যদিবসে (৯৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ) সংসদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সবাই ১৯টি অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রধান বিরোধী দলের বাইরে অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[২৯] ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত থেকে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এলডিপির সদস্য[৩০] মোট ৭৪ কার্যদিবস (১৭ দশমিক ৭০ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ষষ্ঠদশ অধিবেশন থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[৩১] ৮১ কার্যদিবসের মধ্যে মোট ৬২ কার্যদিবস (৭৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ৩৩৬ দিন (মোট কার্যদিবসের প্রায় ৮০ দশমিক ৩৮ শতাংশ)। অন্যদিকে প্রধান

[২৭] ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ৫৫ শতাংশ, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৮ শতাংশ, বিভিন্ন বিবৃতিতে ৩ শতাংশ, কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৪ শতাংশ সময় ব্যয় করা হয়।

[২৮] নরসিংদী-৩ আসনের জহিরুল হক ভূঞা মোহন।

[২৯] নোয়াখালী-৬ আসনের ফজলুল আজিম।

[৩০] চট্টগ্রাম-১৩ আসনের ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম।

[৩১] টাঙ্গাইল-৩ আসনের আমানুর রহমান খান রানা।

বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১০ দিন (প্রায় ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশি ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৫৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সংসদে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীদের যথাসময়ে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি স্পিকার[৩২] ও প্রধানমন্ত্রীর[৩৩] আলোচনায় সরাসরি প্রাধান্য পেয়েছে। স্পিকারের ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমেও তাদের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[৩৪]

৩.৩ সংসদ বর্জন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৪২ কার্যদিবস বা প্রায় ৮১ দশমিক ৮১ শতাংশ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসে ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে টানা ১৭ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে ১৯তম কার্যদিবসে সংসদে ফিরে আসে। প্রথম অধিবেশনের পর দীর্ঘ ৬৪ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার পর ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ চতুর্থ অধিবেশনে বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয় এবং মোট ২০ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। পঞ্চম অধিবেশনে এক দিন (প্রথম কার্যদিবস) উপস্থিত ছিল, এরপর দুটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে এবং মোট ৪২ কার্যদিবস পর অষ্টম অধিবেশনে আবার সংসদে যোগদান করে। এই অধিবেশনে কেবল সাত দিন উপস্থিত থাকার পর পুনরায় পর পর তিনটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে, মোট ৭৭ কার্যদিবস পর দ্বাদশ অধিবেশনে সংসদে যোগদান করে তিন দিন উপস্থিত থাকার পর তারা পুনরায় সংসদ বর্জন করে। এরপর পাঁচটি অধিবেশন (১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭তম) অতিবাহিত হলেও প্রধান বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয়নি। দীর্ঘ ৮২ কার্যদিবস অতিবাহিত করে অষ্টাদশ অধিবেশনে যোগ দিয়ে ২১ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। ১৪ কার্যদিবস বর্জনের পর নবম সংসদের সর্বশেষ ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে ১৩তম কার্যদিবসে মাত্র এক দিন উপস্থিত থেকে বাকি সময় বর্জন করে।

চিত্র ৩ : কয়েকটি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের শতকরা হার।

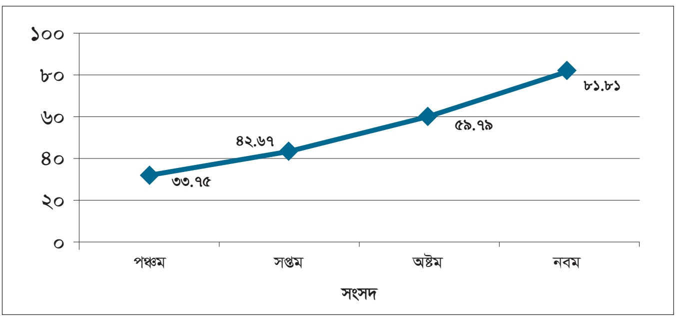

৩২ *দৈনিক সমকাল*, ১২ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৩৩ *দৈনিক যুগান্তর*, ১৩ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৩৪ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩ এপ্রিল ২০১০ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের হার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পঞ্চম সংসদে এই হার ছিল প্রায় ৩৪ শতাংশ, অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয় ৬০ শতাংশ এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১ দশমিক ৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।[৩৫] সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার একাধিকবার বিরোধীদলীয় চিফ হুইপের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের সংসদে যোগদানের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্যের এক দিনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩ হাজার ৫৫৮ টাকা। এ হিসাবে বিরোধী জোটের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লাখ ৭৩ হাজার টাকা।[৩৬]

৩.৪ ওয়াকআউট

মোট ৩৮টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী জোটের দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্য (স্বতন্ত্র) মোট ৫৪ বার ওয়াকআউট করেন। প্রধান বিরোধী জোট ৪১ বার এবং স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম একা ১৩ বার অধিবেশন থেকে বিভিন্ন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকআউট করেন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

- রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবাদ
- মন্ত্রী ও সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্যের প্রতিবাদ
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠনের ওপর প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী জোটের আসন বিন্যাস যথোপযুক্ত না হওয়ার প্রতিবাদ
- সরকারি দলের সদস্যদের অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ
- বিল-সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য প্রদানের সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদ
- বিল পাসের প্রতিবাদ
- পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদ
- মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদ

---

[৩৫] ষষ্ঠ সংসদের অধিবেশন কেবল চার দিন স্থায়ী ছিল বিধায় তা এই চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তথ্যসূত্র : *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে : বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[৩৬] সংসদ সদস্য হিসেবে একজন সংসদ সদস্য মাসিক ভিত্তিতে সম্মানী ২৭ হাজার ৫০০ টাকা, আপ্যায়ন ভাতা ৩ হাজার টাকা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ৭ হাজার ৫০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৭০০ টাকা, টেলিফোন বিল ৭ হাজার ৮০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ ৯ হাজার টাকা, গাড়ি ভাতা ৪০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য (লন্ড্রি, ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি) খরচ বাবদ ১১ হাজার ২৫০ টাকা পেয়ে থাকেন। সংসদে অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা, নির্বাচনী এলাকার জন্য থোক বরাদ্দ এবং বিমা বাবদ প্রাপ্য ভাতা এই প্রাক্কলনে সংযোজন করা হয়নি। সংসদ সদস্য হিসেবে মোট যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত একজন সংসদ সদস্যের এক দিন অনুপস্থিতি বা বর্জনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩ হাজার ৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধী জোটের প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের (৩৪২ কার্যদিবস) মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা।

৩.৫ কোরাম-সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশনকক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। সার্বিকভাবে এ ১৯টি অধিবেশনে মোট ২২২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩২ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজের বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম-সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[৩৭] এ হিসাবে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম-সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ১০৪ কোটি ১৭ লাখ ৬৮ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা।

৩.৬ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে ৪১৮টি কার্যদিবসে মোট ২৭১টি বিল পাস করা হয়েছে যার, ২৬৮টি সরকারি বিল এবং তিনটি বেসরকারি বিল। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১০৯ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট সময় ব্যয় করা হয়, যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৮ দশমিক ২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা ২৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট বিভিন্ন বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য দেন, যা আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।[৩৮]

চিত্র ৪ : আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার।

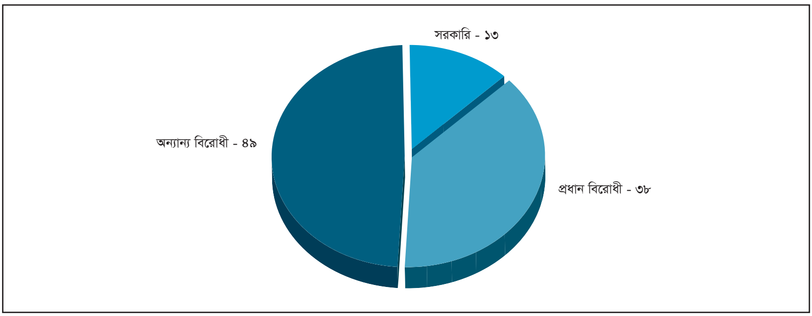

[৩৭] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাঁদা ৯৫ লাখ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩ দশমিক ৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এই হিসাবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম- ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কোরাম-সংকটের মোট অর্থমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরও কিছু সেবা খাত রয়েছে, যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

[৩৮] ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ভারতের লোকসভায় প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং রাজ্যসভায় প্রায় ৪৪ শতাংশ সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মোট ১৫ জন সংসদ সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং ৫৩ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে একজন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য, ছয়জন প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য এবং তিনজন সরকারি দলের সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী উভয় অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ১২ মিনিট।[৩৯]

এই সংসদের অধিবেশনগুলোতে পূর্ববর্তী সংসদের মতোই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান।[৪০] সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[৪১] যেসব সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলি ও বিরামচিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম বছরে উল্লেখ্য যে, প্রথম অধিবেশনে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দেওয়া প্রস্তাবগুলো সংসদে উত্থাপিতই হয়নি।[৪২] তবে প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলেও অন্যান্য বিরোধীর (স্বতন্ত্র সদস্য) অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

৩.৬.১ *আলোচিত উল্লেখযোগ্য আইন-সম্পর্কিত তথ্য*

'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১' পাসের ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনী-সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিতে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১১ মাসে বিশেষ কমিটির ২৭টি বৈঠক হয়, যেখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের বক্তব্য নেওয়ার দাবি করা হয়। সংসদে ২০১১ সালের ৮ জুন বিশেষ কমিটি ৫১টি সুপারিশসহ এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করে, যার কোনোটি গৃহীত হয়নি। অধিবেশনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পাশাপাশি সরকারি দলের পক্ষ থেকে আরও নয়জন বিলের ৫১টি দফায় ৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব করলেও তা সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। শুধু স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটটিই বিভক্তি ভোটের সময় বিপক্ষে পড়েছে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি প্রায় চার ঘণ্টা সময়ে পাস করা হয়।

---

[৩৯] ২০০৯ সালে ভারতে লোকসভায় ৬০ শতাংশ বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ১-২ ঘণ্টা আলোচনা করতে দেখা যায়। www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

[৪০] সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১।

[৪১] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোনো আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোনো বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে।
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

[৪২] *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

উল্লেখযোগ্য কিছু বিল যেমন–‘দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১১’ প্রায় ১৮ মিনিট, ‘তথ্য অধিকার বিল, ২০০৯’ প্রায় তিন মিনিট, ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল, ২০১০’ প্রায় ১৫ মিনিট, ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ২০০৯’ প্রায় ১১ মিনিট এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩’ প্রায় চার মিনিট, ‘আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী দ্রুত বিচার (সংশোধন) বিল, ২০১০’ প্রায় পাঁচ মিনিট, ‘স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১’ এবং ‘উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১১’ প্রায় ১০ মিনিট সময়ে পাস করা হয়। ‘সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি বিল, ২০১০’, যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি।

৩.৬.২ *বাজেট আলোচনা*

বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ২৮৯ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট, যা মোট সময়ের প্রায় ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। এ ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩১৮ জন সদস্য এক বা একাধিক বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন, ৩২ জন সদস্য (প্রায় ৯ শতাংশ) কোনো বাজেট অধিবেশনেই আলোচনায় অংশ নেননি। পাঁচটি অধিবেশনেই বাজেটের ওপর আলোচনার সুযোগ পান ৯১ জন সদস্য। এদের মধ্যে ৯০ জন সরকারি দলের এবং স্বতন্ত্র সদস্য একজন। প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও শেষ বাজেট অধিবেশনে এই জোটের ৩৩ জন সদস্য বাজেট আলোচনার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রধান বিরোধী জোটের বাজেট আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন, প্রতিপক্ষ দলের সদস্যদের বক্তব্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ, সংসদের বাইরে তাদের দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের আচরণের বিবরণ–এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। বাজেট আলোচনায় খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গ আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিষয়-সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট-সম্পর্কিত মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আগের মতো বিদ্যমান রয়েছে।

৩.৭ সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি

সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিশ উপস্থাপন, জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯-১৩ সালের ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩২১ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না-কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২৯ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং একজন অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য। সরকারি দলের তিনজন সদস্য সব পর্বে অংশ নেন। ছয়টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্যসংখ্যা ১৬ জন। সর্বনিম্ন একটি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৪১ জন। মোট ২৯ জন সদস্য (৮ দশমিক ৩ শতাংশ) কোনো পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

৩.৭.১ *প্রশ্নোত্তর পর্ব*

১৯টি অধিবেশনের মধ্যে ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। ৪৭টি কার্যদিবসে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৩৮ ঘণ্টা ৭ মিনিট। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ৯৯টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ২৬১টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা তিনটি মূল প্রশ্ন এবং আটটি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক ১০টি মূল প্রশ্ন ও ১৬টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

এই পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সদস্যরা প্রশ্ন করেন, তার মধ্যে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো যেন ভারতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্য বিদ্যুৎসুবিধা চালু করা, খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশের ভেতরে গ্যাস অনুসন্ধানকারী বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সমুদ্রবন্দরের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা, বেসরকারি টিভি চ্যানেল জঙ্গিবাদকে মদদ দিলে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত অবগত করা, দ্রুততম সময়ে পুঁজিবাজার-সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা, পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ণ প্রকল্প, সুশিক্ষিত জাতি গঠনে গৃহীত পদক্ষেপ, বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পকারখানা চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পররাষ্ট্রনীতি, ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মেগাসিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিশুশ্রম বন্ধে করণীয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন-সংক্রান্ত পরিকল্পনা, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা, জঙ্গিবাদ, বিডিআর বিদ্রোহ, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তা নির্মাণ, আন্তর্জাতিকভাবে জামদানি শাড়ি রপ্তানি পরিকল্পনা, সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পদক্ষেপ, ঢাকাকে বিশ্বমানের শহরে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, বেকারত্ব দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ ও তাদের জন্য পরিকল্পনা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য গৃহীত প্রকল্প, বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর বার্ন ইউনিটগুলো উন্নত করার পরিকল্পনা, পোশাকশিল্পের প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মকর্তা নিয়োগ, রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্পের সফলতা, সরকারি অফিসে দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, সুন্দরবনের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও এর প্রতিবাদে আন্দোলন, আমদানি ও রপ্তানি খাতে সরকারের সফলতা, ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯টি অধিবেশনে নির্ধারিত মোট ৩৮৯ কার্যদিবসের মধ্যে ২১৭ কার্যদিবস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেন। বাকি ১৭২ কার্যদিবস সদস্যদের প্রশ্নগুলো টেবিলে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৩৮৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৩৯২টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করা হয়। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ২৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮৭টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য, অন্যান্য বিরোধী দলের স্বতন্ত্র একমাত্র সদস্য কর্তৃক মোট ২৬টি মূল প্রশ্ন ও ৪১টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

মোট ৪০টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ২৬টি এবং অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য ১৭টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি উপস্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশি (৪৭৮টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্বরাষ্ট্র (৪০৮টি), যোগাযোগ (৩৭১টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং অর্থ (৩৬৮টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৩৬০টি), শিক্ষা (৩৩৫টি), অর্থ (৩২৮টি) ও পানি সম্পদ (৩১০টি) উল্লেখযোগ্য।

৩.৭.২ *সিদ্ধান্ত প্রস্তাব*

বিধি ১৩১ অনুযায়ী উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১২৩টি প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। প্রথম অধিবেশনে দুটি, চতুর্থ অধিবেশনে একটি এবং দ্বাদশ অধিবেশনে দুটিসহ মোট পাঁচটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলো হলো−

- বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা নয় এমন ব্যক্তিদের মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা।
- দেশের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সংসদ বাংলাদেশ নামে টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন করা।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য যারা বাধাগ্রস্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধিবিধান গ্রহণ করা।
- দেশের সব উপজেলা সদরে অন্তত একটি করে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা।

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হলো- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে- এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান।

৩.৭.৩ *জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ*

কার্যপ্রণালিবিধি ৭১-এ মোট ৭৩৮০টি নোটিশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে ৬২০৫টি সরকারি দলের, ৯৯৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৬২টি অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিশগুলোর মধ্যে ৪৪২টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিশগুলোর মধ্যে ৪১৯টি সরকারি দলের, ১৩টি প্রধান বিরোধী দলের ও ১০টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিশের মধ্যে ২৮৪টি ১২৬ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিশের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিশ (৩৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী যেসব নোটিশ গ্রহণ করা হয়নি এর মধ্যে মোট ২২৫৪টি নোটিশের ওপর মোট ২৭১ জন সদস্য প্রায় ১০৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ২৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৬৬টি নোটিশ এবং একজন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ১৮টি নোটিশ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত নোটিশের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (৩৩০টি)।

এ ছাড়া বিধি-৬৮ অনুযায়ী জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী রোডমার্চের নামে সারা দেশে যে মিথ্যাচার ও আইনবহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়েছেন তা নিবারণ' প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতোই এ পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিবিষয়ক আলোচনা হয়নি।[৪৩]

৩.৭.৪ *সাধারণ আলোচনা*

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিষয় আলোচনা করা হয়, যা আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.৭.৫ *মুলতবি প্রস্তাব*

মোট ৯১৭টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হলেও প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতি এবং স্পিকার বিধিসম্মত মনে না করার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।

সার্বিকভাবে দেখা যায় সংসদের মূল তিনটি কাজের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি।

৩.৭.৬ *অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার*

১৯১টি কার্যদিবসে অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত ৩০৪টি বিষয়ের ওপর প্রায় ৬৯ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ১১৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১০৩, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ ও অন্যান্য বিরোধী দুজন) অংশগ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরকারি দলের মধ্যে একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৫৬টি বিষয়ের ওপর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেন।

অনির্ধারিত আলোচনার আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের জন্য স্পিকার ও সরকারি দলের সহযোগিতা আহ্বান, সংসদে অসংসদীয় ভাষার

[৪৩] উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ চলাকালীন সরকারের সময় ৩৭টি দেশের সাথে মোট ১৩৮টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। সূত্র : *Bangla News 24.com*, ৬ মার্চ ২০১৩।

ব্যবহারের প্রতিবাদ, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদের ভেতরে ও বাইরে সদস্যদের আচরণ এবং অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ এই পর্বে আলোচ্য বিষয় থাকলেও সেই আলোচনাতেও অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের সমালোচনার চর্চা অব্যাহত ছিল।

৩.৭.৭ *জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি*

নবম সংসদে ৫৩টি কমিটি ও ১৮৩টি উপকমিটি গঠন করা হয়। সংবিধান সংশোধনকল্পে একটি বিশেষ কমিটি এবং একটি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত যা পরে বিলুপ্ত করা হয়। ৫৩টি কমিটি মোট ২০৪৩টি এবং ১৮৩টি উপকমিটি ৬৫০টি বৈঠক করে। সর্বোচ্চ ১৩২টি বৈঠক করে সরকারি হিসাব-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। ১৩টি কমিটি কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে বৈঠক করতে সক্ষম হয়।

৪৫টি কমিটি ১০১টি প্রতিবেদন দিয়েছে। ২২টি কমিটির প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গঠিত হওয়ার পর থেকে ৪৯৩৫টি সুপারিশ করে। ১৭৮৭টি (৪৩ দশমিক ১৭ শতাংশ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২৩টি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। সুপারিশ বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ (প্রায় ৭৯ দশমিক ৭ শতাংশ) লাইব্রেরি-সম্পর্কিত এবং সর্বনিম্ন (প্রায় ১ দশমিক ১৪ শতাংশ) ভূমি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির। সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়নের হার প্রায় ৬৪ শতাংশ এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৩২ শতাংশ। সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে।

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি-সম্পর্কিত ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৬৩ শতাংশ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির গড় হার সবচেয়ে বেশি (৯২ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটিতে ৪০ শতাংশ।

২০টিরও অধিক কমিটির (যেমন–নৌপরিবহন, যোগাযোগ, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য) সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যায়। দুর্নীতি-সম্পর্কিত তদন্তে বিমানের দুর্নীতি, পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন, পূর্ববর্তী স্পিকারের অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিআরটিএর অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করে।

১০টি কমিটি (মৎস্য ও পশু; কৃষি, শ্রম, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, আইন, বিচার ও সংসদ; সরকারি প্রতিশ্রুতি; বাণিজ্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্থায়ী কমিটি) এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, ইউকেএইড ও ইউএনডিপির অর্থায়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক করেছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কমিটি সরকারি অর্থায়নে বৈঠকের আয়োজন করে।

স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

৩.৭.৮ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় প্রায় ২২০ ঘণ্টা ৭ মিনিট সংসদ সদস্যরা বক্তব্য রাখেন, যা মোট সময়ের ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। ২৯৯ জন কোনো না-কোনো অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পান (প্রধান বিরোধী দলের ৩১, সরকারি দলের ২৬৫ এবং অন্যান্য বিরোধী (এলডিপি) ও স্বতন্ত্র সদস্যসহ তিনজন)। সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে (দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎসমস্যা ইত্যাদি) রাজনীতিকীকরণ করে এক দল আরেক দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করে। সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় সংসদ নেতার বক্তব্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্যজুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কার্যক্রমের সমালোচনা, নিজের দলের সরকারের আমলের প্রশংসা এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সমালোচনা। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের বাইরে আলোচনার পরিধি ছিল অনেক বেশি। এমনকি কেউ কেউ তাদের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই ব্যয় করেন তাদের নির্বাচনী এলাকা-সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা করে।

সারণি ১ : অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১১১	১০৩	৭	১
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৮৪	২৫৫	২৮	১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১০৭	১০০	৬	১
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭)	৯৬	৯৩	২	১
জনগুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	১২৬	১১৭	৮	১
জনগুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	২৭১	২৪৫	২৫	১
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)	১৪	১৪	-	-
আইন প্রণয়ন	৫৭	৩০	২৫	২
বাজেট আলোচনা	৩১৮	২৮২	৩৩	৩
অনির্ধারিত আলোচনা	১১৯	১০৩	১৪	২
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৯৯	২৬৫	৩১	৩

সামগ্রিকভাবে অধিবেশনের সব ধরনের কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, দুজন সদস্য (নাটোর-৪, নেত্রকোনা-৪) কোনো পর্বে অংশ নেননি।

৩.৮ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশি সময় উপস্থিত প্রায় ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ নারী সদস্য (সরকারি দলের ৫১ দশমিক ৬ শতাংশ)। সংসদ বর্জনের কারণে প্রধান বিরোধী দলের নারীদের সবার উপস্থিতি ছিল মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ বা তার কম। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ২১ জন নারী সদস্য ৬০টি প্রশ্ন করতে প্রায় ৫৪ মিনিট ব্যয় করেন, যা এই পর্বে প্রশ্ন করার মোট সময়ের ১২ শতাংশ। প্রশ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবকাঠামো, প্রশাসন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৯ জন নারী সংসদ সদস্য ১০৫০টি প্রশ্ন উত্থাপন করতে প্রায় ১০ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট সময় নিয়েছেন, যা প্রশ্ন করায় ব্যয়িত মোট সময়ের ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ। সর্বোচ্চ (৯৬টি) প্রশ্ন করা হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত ৬৫টি এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত ৬২টি।

৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৬টি গৃহীত নোটিশের (সর্বোচ্চ সাতটি করে নোটিশ স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট) ওপর আলোচনা হয়। ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৮২টি নোটিশ (সর্বোচ্চ নোটিশ ৬১টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত) আলোচিত হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সংসদে সংশ্লিষ্ট আইন উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা, বিল উত্থাপন ও পাসের অনুমতির জন্য অংশগ্রহণ করেন। এর বাইরে অর্থাৎ কোনো আইন উত্থাপনে আপত্তি এবং এর ওপর যাচাই-বাছাই কিংবা সংশোধনে প্রস্তাব করতে ১০ জন নারী সদস্য প্রায় ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট অংশগ্রহণ করেন। বাজেটের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোচনায় মোট ৬৭ জন সদস্য প্রায় ৪৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট অংশ নেন। এদের মধ্যে আটজন বিরোধী দলের সদস্য। সরাসরি নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যের মধ্যে তিনজন প্রধান বিরোধী দলের এবং সংরক্ষিত আসনের ৪৮ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবের আলোচনায় সরাসরি নির্বাচিত তিনজন সদস্যসহ মোট ১৭ জন নারী সদস্য অংশ নেন। অনির্ধারিত আলোচনায় ২১ জন সদস্য ৯ ঘণ্টা ২৬ মিনিট অংশ নেন, যেখানে সাতজন সরাসরি নির্বাচিত। মোট দুজন প্রধান বিরোধী দলের নারী সদস্য এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৬৩ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১৬ জন সরাসরি নির্বাচিত (একজন প্রধান বিরোধী দলের)। সংরক্ষিত আসনের ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

৪৮টি স্থায়ী কমিটিতে মোট ১২ জন নারী সদস্য রয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। ছয়টি কমিটির সভাপতি হিসেবে চারজন নারী সদস্য[৪৪] মনোনীত হয়েছেন। নবম

[৪৪] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালিবিধি-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

সংসদের সপ্তদশ অধিবেশন থেকে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের[৪৫] দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নারী সদস্যের ওপর।

৩.৯ স্পিকারের ভূমিকা

সভাপতি হিসেবে স্পিকার প্রায় ৭১২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট (৫৩ শতাংশ), ডেপুটি স্পিকার প্রায় ৫১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট (৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা প্রায় ১০৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (৮ শতাংশ) দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্যদের অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার বন্ধে মাননীয় স্পিকারের রুলিং এবং দলমত-নির্বিশেষে সব সদস্যের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে সরকারি দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহার কিংবা বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় স্পিকারকে নীরব থাকতে দেখা যায়। সংসদীয় কার্যপ্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের সহায়ক হয়েছে। তবে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকারদলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৪. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

৪.১ ইতিবাচক দিক

- নবম সংসদে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার অষ্টম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩ শতাংশ হয়েছে।
- বাজেট আলোচনায় খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা বিষয়-সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন।
- প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য; সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপনের চর্চা দেখা যায়। ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনায় সরকারদলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ।

[৪৫] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

- অধিবেশনকক্ষের বাইরে প্রতিদিনের কার্যসূচি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সংসদ কার্যক্রমের তথ্য প্রাপ্তি সদস্যদের কাছে সহজতর হওয়া।
- নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়, যেখানে তিনটি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়।
- কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন এবং সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের তদারকি নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয়, যা অন্যান্য কমিটির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক নির্দেশনা দিতে পারবে।

৪.২ নেতিবাচক দিক

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও এর মাত্রা সংকটজনকভাবে বৃদ্ধি। ফলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় অষ্টম সংসদের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম; আইন প্রণয়নে খুব কমসংখ্যক সদস্যের (নারী সদস্যসহ) অংশগ্রহণ দেখা যায়।
- সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তিবিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া।
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের আহ্বান এবং রুলিং সত্ত্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
- সংসদ অধিবেশনে কোরাম-সংকট অব্যাহত, কোরামের অভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ব্যাহত।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধানের অস্পষ্টতা সংসদে সদস্যদের মতামত প্রকাশে প্রতিবন্ধক, যা নবম সংসদেও অব্যাহত।
- সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ; মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটিতে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য রয়েছেন, যা কার্যপ্রণালিবিধি ১৮৮ (২)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণবিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি।
- বিরোধী দলের মধ্য থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের অঙ্গীকার ও স্পিকারের দল থেকে পদত্যাগ করার আলোচনা করলেও পরবর্তী কালে সরকার থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোনো দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না, কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে– প্রধান বিরোধী দলের ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকলেও নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।

- বিরোধীদলীয় নেতার গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস এবং সংসদে সরকারি দলের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী সংসদের পরিপ্রেক্ষিতে নবম সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতার গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি।

সারণি ২ : অষ্টম ও নবম সংসদের প্রথম থেকে শেষ অধিবেশনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম থেকে উনিশতম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২ শতাংশ সদস্য সরকারি ও ২৮ শতাংশ সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮ শতাংশ সদস্য সরকারি ও ১২ শতাংশ সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	মোট কার্যদিবস ছিল ৩৭৩ এবং ওই কার্যবিদসে মোট ১১৮২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট।	মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ ও ওই কার্যদিবসে মোট ১৩৩১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৫৫ শতাংশ। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশি সময় উপস্থিত ছিলেন ২৫ শতাংশ সদস্য।	নবম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩ শতাংশ। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশি সময় উপস্থিত ছিলেন ৪১ শতাংশ সদস্য।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৫২ দশমিক ২৭ শতাংশ (১৯৫ দিন)	মোট কার্যদিবসের ৮০ দশমিক ৩৮ শতাংশ (৩৩৬ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ১২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ (৪৫ দিন)	মোট কার্যদিবসের ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ (১০ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন	২৩টি অধিবেশনের ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ দিন বা ৬০ শতাংশ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।	১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৪২ দিন বা ৮১ দশমিক ৮১ শতাংশ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।
বিল পাস	১৮৫টি বিল পাস, ১৮৪টি সরকারি ও একটি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ২০ মিনিট।	২৭১টি বিল পাস, ২৬৮টি সরকারি ও তিনটি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ১২ মিনিট।
কোরাম-সংকট	মোট সময় প্রায় ২২৭ ঘণ্টা। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম-সংকট ছিল গড়ে ৩৭ মিনিট।	মোট কোরাম-সংকট প্রায় ২২২ ঘণ্টা। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম-সংকট ছিল গড়ে ৩২ মিনিট।
সংসদীয় কমিটি	প্রথম অধিবেশনে মাত্র পাঁচটি কমিটি গঠিত, সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল অনুপস্থিত।	প্রথম অধিবেশনেই সব কমিটি গঠিত, তিনটি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।

৫. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবির সুপারিশ

৫.১ সদস্যদের উপস্থিতি-সংক্রান্ত

১. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

২. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

৩. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার ও সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ-সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৪. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন–এরকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতাকে সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।

৫.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ‘সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল, ২০১০’ চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্য যেকোনো বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরির জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৯. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

১০. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময়-সংক্রান্ত

১১. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

১২. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

১৩. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

৫.৪ তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত

১৪. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মতো ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথাসময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ প্রকাশনাগুলো আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

১৫. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সব গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে।

৫.৫ সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত

১৬. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১৭. সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনে গণভোটের প্রবর্তন করতে হবে।

৫.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১৮. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য বা আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে- এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১৯. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২০. যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ওই সদস্য মন্ত্রী হলেও তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন- এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*

ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় একক (প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি) ও সামষ্টিক (সংসদীয় কমিটি) এই দুই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। একক ব্যবস্থার তুলনায় সামষ্টিক ব্যবস্থায় অধিক গভীরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে দেশের কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি সক্রিয়, সে দেশের আইনসভা তত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। বাংলাদেশে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে কমিটি গঠন, সভা অনুষ্ঠান ও বিরোধী দলের উপস্থিতি–এই কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কমিটির কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়নি। কমিটির গঠন, মেয়াদ, উপস্থিতি, বৈঠক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি থাকলেও বিধি লঙ্ঘন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে আইনসভার কার্যক্রম নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণার অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই গবেষণা সম্পন্ন করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকরতা পর্যালোচনা করা এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা;
- কমিটির কার্যকরতার চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা এবং
- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৩ গবেষণার আওতা

উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, কমিটি গঠন, কমিটিতে সভাপতি ও সদস্যদের উপস্থিতি ও ভূমিকা, কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের প্রকৃতি ও বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, কমিটির কার্যকরতা এবং অন্যান্য দেশের

---

* ২০১৫ সালের ৯ আগস্ট ঢাকায় টিআইবির সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

অভিজ্ঞতা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় নবম সংসদের পুরো সময় (২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) এবং দশম সংসদের ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময় অন্তর্ভুক্ত।

১.৪ গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় নবম সংসদের ৫১টি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির ওপর এবং বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য কেস হিসেবে ১১টি কমিটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির সদস্য ও সভাপতি, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নথিপত্র ইত্যাদি। ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. সংসদীয় কমিটি পরিচালনার আইনগত ভিত্তি : কার্যপরিধি, ক্ষমতা ও এখতিয়ার

বাংলাদেশের সংবিধান[৪৬] ও কার্যপ্রণালিবিধি[৪৭] অনুযায়ী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি পর্যালোচনা এবং অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা, কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।

সংবিধান ও কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। কমিটি সুপারিশ করতে পারবে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই। এ ছাড়া কমিটি যেকোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে, এমন বিধান করার বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আইন এখনো প্রণীত হয়নি।

৩. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা বিশ্লেষণ

৩.১.১ কমিটি গঠন ও দলীয় প্রতিনিধিত্ব

নবম ও দশম উভয় সংসদেই প্রথম অধিবেশনে সবগুলো কমিটি গঠিত হয়। সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকারদলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন, যা অধিবেশনে

[৪৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬(২)।

[৪৭] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ২৪৮।

কণ্ঠভোটে পাস হয়।[৪৮] পদাধিকার বলে মন্ত্রী কমিটির সদস্য। দেখা যায়, কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক-সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দল এবং দলীয়প্রধানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিরোধী দলের সদস্যরা কমিটিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। সভাপতি নিয়োগে সংসদে দল অনুযায়ী আনুপাতিক হারের প্রতিফলন দেখা যায়নি। যেমন- নবম ও দশম সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ১৩ ও ১৭ শতাংশ; কমিটিতে সদস্য হিসেবে তা ছিল যথাক্রমে ১১ ও ১৭ শতাংশ এবং সভাপতি হিসেবে যথাক্রমে ৪ ও ২ শতাংশ, যদিও কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। নবম সংসদে কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১১টি কমিটি মোট ৩১ বার এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি মোট তিনবার পুনর্গঠিত হয়। তবে কমিটি পুনর্গঠনের কারণ কোনো ক্ষেত্রেই প্রকাশ করা হয়নি।

৩.১.২ *কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত*

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন কোনো সদস্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।[৪৯] এ ছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯-এ সংসদ সদস্য প্রার্থীদের পেশা ও আয়ের উৎসসহ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিগত বা যৌথ সংশ্লিষ্টতার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক[৫০] করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, হলফনামার তথ্য অনুযায়ী কমিটির নবম সংসদের ৫১টি কমিটির মধ্যে ছয়টি কমিটি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির মধ্যে পাঁচটি কমিটিতে সদস্যের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা ছিল। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নবম সংসদের ১১টি কমিটির ৩৮ জন সদস্য সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী নয়টি কমিটিতে ১৯ জন সদস্যের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা ছিল।[৫১] কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে আগের মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।

৩.২ কমিটির সভা অনুষ্ঠান

কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী প্রতিটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠক করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও নবম সংসদে ৫১টি কমিটির মধ্যে ১৩টি কমিটি এবং দশম সংসদে ৫০টি কমিটির মধ্যে তিনটি কমিটি বিধি অনুযায়ী সভা করে। উল্লেখ্য, পিটিশন কমিটি, বিশেষ অধিকার ও

[৪৮] কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী সংসদ আগে থেকে সভাপতি মনোনীত না করে থাকলে কমিটির সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন। তথ্যসূত্র : *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ১৯১ (১) (২)।

[৪৯] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ১৮৮ (২)।

[৫০] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ১২।

[৫১] এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সর্বোচ্চ চারজন করে এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে দুজন সদস্য রয়েছেন, যাদের কমিটির কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট ব্যবসা ছিল।

কার্যপ্রণালিবিধি-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নবম ও দশম সংসদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ের মধ্যে কোনো সভাই করেনি।

৩.৩ সভায় অংশগ্রহণ

কমিটি সভায় কোরাম-সংকট দেখা যায়নি। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির মধ্যে নবম সংসদে নয়টি এবং দশম সংসদে দুটি কমিটির উপস্থিতির তথ্য পাওয়া যায়। নবম সংসদে গড় উপস্থিতি ছিল ৬৪ শতাংশ এবং দশম সংসদে গড় উপস্থিতি ৬২ শতাংশ। তবে সভাপতির বিলম্ব উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কমিটি সভায় সরকারি দলের সদস্যদের গড় উপস্থিতি নবম সংসদে ছিল ৬০ শতাংশ ও দশম সংসদে ৫৮ শতাংশ; অন্যদিকে বিরোধী দলের সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল নবম সংসদে ৩১ শতাংশ, দশম সংসদে ৪৭ শতাংশ। নবম সংসদে নয়টি কমিটিতে এমন সদস্য ছিলেন যারা পরপর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনো সদস্য পরপর দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব আনার বিধান রয়েছে।[৫২] তবে এ ক্ষেত্রে পদচ্যুত করার বাধ্যবাধকতা নেই। নবম সংসদে নয়টি কমিটির মধ্যে সর্বোচ্চ সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন পরপর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। দশম সংসদে দুটি কমিটিতে তিনজন করে সদস্য দুই বা ততোধিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, অনুপস্থিত থাকার অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক নয়।

৩.৪ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা

সংসদে উত্থাপিত খসড়া বিলের যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির থাকলেও নবম ও দশম সংসদে কোনো বিলের জনমত যাচাই-বাছাই করা হয়নি।[৫৩] কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির সুপারিশক্রমে ৭৩টি বিল পাস হয়েছে, যার মধ্যে ৬৯টি বিলে সংসদ সদস্যরা জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব দেন। ৩৭টি বিলের ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব অধিবেশনেই কণ্ঠভোটে নাকচ হয় এবং ৩২টি বিলের ক্ষেত্রে সদস্য অনুপস্থিত থাকায় প্রস্তাব সংসদের অধিবেশনে উত্থাপিত হয়নি। একদিকে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল, আর অন্যদিকে কমিটির পক্ষ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিধিতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কার্যপ্রণালিবিধিতে[৫৪] নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজেট কমিটিতে পাঠানো হয় না। উল্লেখ্য, কমিটির 'সুপারিশে' খসড়া বিলের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য মতামত লক্ষ করা যায় না; সুপারিশ হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত।

---

[৫২] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ১৯৩।

[৫৩] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ২২০।

[৫৪] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ১১১ (৩)।

৩.৫ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণত সভাপতি এবং অধিকাংশ সদস্য সরকারি দলের হওয়ায় তাদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সংসদ নেতা বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত নেই। বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা, বাজেট ঘাটতি, মন্ত্রী-সভাপতি অন্তর্দ্বন্দ্ব, সভাপতির ব্যক্তিত্ব, দলীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব, কমিটির কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নির্ভরশীল।

কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটি নবম সংসদে মোট ১,৮৯১টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩৯ শতাংশ) বাস্তবায়িত হয় না। তবে কমিটির সিদ্ধান্তের যার মধ্যে ৪১ শতাংশ বাস্তবায়িত হয় এবং ২০ শতাংশ সিদ্ধান্ত নবম সংসদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয় না। উল্লেখ্য, অনেক সিদ্ধান্ত সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবায়িত হয় না। আবার দেখা যায় আলোচনার বিষয়বস্তু পরবর্তী সভায় স্থানান্তর, পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়কে কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে সিদ্ধান্তের ধরনভেদে বাস্তবায়নের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নবম সংসদের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তগুলোকে (৩৫৭টি) ধরনভেদে আটটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চসংখ্যক (১৭৫টি) হলেও বাস্তবায়নের হার কম (২৩ শতাংশ)। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যক (৫টি) সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ (১০০ শতাংশ)। আবার বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ছিল সর্বোচ্চ (৩৪ শতাংশ)।

দুর্নীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত : কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে দুর্নীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। নবম সংসদে ১১টি কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কেবল ৪ শতাংশ ছিল দুর্নীতি-সম্পর্কিত। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, দুর্নীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ৫০ শতাংশ পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত। জবাবদিহির পরিবর্তে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিকে রক্ষায় কমিটি কাজ করে এমন দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, আবার কমিটির তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও তার ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

৩.৬ কমিটির তলব ও সাক্ষ্যগ্রহণ

কমিটি যেকোনো নথি চেয়ে পাঠানোর কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে।[৫৫] কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নথি আহ্বান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয়; তবে

[৫৫] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি*, বিধি ২০৩।

এ-সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার কমিটির নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা বা অগ্রাহ্য করার কারণে তা ফলপ্রসূ হয় না। উল্লেখ্য, তলবকৃত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও তা প্রণয়ন করা হয়নি। এ ছাড়া সরকারের সমসাময়িক কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়।

৩.৭ কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা

কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে। বিধি অনুযায়ী গণশুনানি, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ, পরিদর্শন, মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে কমিটি সংসদীয় বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। উদাহরণস্বরূপ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সাতটি মতবিনিময় সভার এবং চারটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত থাকলেও যথাক্রমে তিনটি ও একটি সম্পন্ন হয়। কমিটির জনগণের সম্পৃক্ততাবিষয়ক কার্যক্রম বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। যেমন- গণশুনানির ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে অপূর্ণতা রয়েছে। জনসম্পৃক্ততাবিষয়ক কার্যক্রমের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না; কমিটির বাজেটেও এ খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না। গণশুনানি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৮ নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

সংসদীয় কমিটিতে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রথমবার দশম সংসদে ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। নবম সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ২০ শতাংশ, আর কমিটিতে এটি ছিল ১০ শতাংশ। দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে (২০ শতাংশ) কমিটিতে সদস্যপদ দেওয়া হয়। তবে সভাপতির ক্ষেত্রে নবম ও দশম উভয় সংসদেই প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অনুসরণ করা হয়নি। সভাপতির ক্ষেত্রে নবম সংসদে ছয়টি কমিটিতে চারজন ও দশম সংসদে আটটি কমিটিতে পাঁচজন নারী সভাপতি রয়েছেন। উল্লেখ্য, এর চারটিতেই সংসদের স্পিকার হিসেবে পদাধিকারবলে নারী সভাপতি মনোনীত হন। কমিটি সভায় নারী সদস্যের সংখ্যার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা গেলেও নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থান দেখা যায় না। যে নয়টি কমিটির উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে, এর মধ্যে পাঁচটি কমিটিতেই পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যের উপস্থিতি কম। কমিটির নারী সভাপতির ক্ষেত্রেও বিলম্বে উপস্থিতি এবং সে কারণে সদস্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টির অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে।

৩.৯ সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা

কমিটির কাজ নির্বাহ করার জন্য সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তার ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। সংসদ সচিবালয়ের সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। আলোচ্যসূচি নির্ধারণে কমিটির সদস্য এবং কর্মকর্তাদের

অনেক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে। একদিকে তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম, অন্যদিকে ডেপুটেশনে কর্মরত জনবলের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের অভাব রয়েছে। কমিটির সভাপতি এবং সদস্যদের পক্ষ থেকেও কমিটির কর্মকর্তাদের যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা দেওয়ায় ঘাটতি রয়েছে। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতিমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয় না। আবার বিষয়-সংশ্লিষ্ট গবেষণা করে কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ঘাটতিও লক্ষণীয়।

৩.১০ তথ্যের উন্মুক্ততা

কমিটির কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সব কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে না, আর যেসব কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাও নিয়মিত নয়। এ ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালিবিধিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কমিটিভেদে প্রতিবেদনের কাঠামোর ভিন্নতা রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি দেখা যায়। সদস্যদের উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি, তলব ও সাক্ষ্যগ্রহণ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, সভায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কমিটির অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না ইত্যাদি তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কমিটির প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা করা হয় না। কমিটির সভায় জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। অন্যদিকে সংসদের ওয়েবসাইটে কমিটির কার্যক্রম-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকে না।

৪. বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা

যুক্তরাজ্যসহ উন্নত গণতন্ত্রের বিভিন্ন দেশে সংসদীয় কমিটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাজ্য ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক হারে কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি করা হয় এবং মন্ত্রী কমিটির সভাপতি বা সদস্য হন না। উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের উত্তর দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে এবং কমিটির সুপারিশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। তবে যুক্তরাজ্যে কমিটি সভার আলোচনা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সাক্ষ্য প্রদান ও তলবের পরিপ্রেক্ষিতে হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্দেশ থাকে। সরকারের উচ্চপদে নিয়োগে তদারকি করতে পারে কমিটি। এমনকি বাজেট পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংসদীয় কমিটির সম্পৃক্ততা থাকে। এ ছাড়া কমিটির কার্যকরতা বিবেচনার জন্য এবং দুটি সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম তদারকির জন্য পৃথক একটি কমিটি থাকে।

৫. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন ও সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ থাকলেও সার্বিকভাবে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকর হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক,

রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ কারণ হিসেবে কাজ করছে, যেগুলো আবার কমিটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সার্বিকভাবে দেখা যায়, কমিটির গঠন ও কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব রয়েছে। কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান; সদস্য নির্বাচনের সময় বা পরবর্তীকালে এ বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিকে ব্যবহার করেন।

কমিটির সিদ্ধান্তের একটি বড় অংশ বাস্তবায়িত হয় না, যেহেতু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নেই, আর কমিটির কার্যক্রমকে অনেক সদস্য বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। আরও দেখা যায়, কমিটিতে দুর্নীতি-সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। কমিটির কার্যক্রমে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তায় ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়।

কমিটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়। কমিটির কার্যক্রম সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং কমিটি-সম্পর্কিত তথ্যেও জনগণের অভিগম্যতা কম। এ ছাড়া কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই সীমিত পর্যায়ের। আরও দেখা যায়, কমিটির কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়নকাঠামো নেই। বিভিন্ন কমিটি ও দুটি সংসদের মধ্যবর্তী সময়ের কার্যক্রমের সমন্বয়েরও ঘাটতি রয়েছে।

আইন ও আইনের প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসহ প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে একনজরে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব নিচে দেখানো হলো–

চিত্র ১ : স্থায়ী কমিটির প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার পেছনে কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• আইনগত সীমাবদ্ধতা (এখতিয়ার, গঠন, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, তথ্য প্রকাশ) • আইনের প্রয়োগের ঘাটতি • রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি • সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা • স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব বিস্তার • সংসদ সচিবালয়ের সাংগঠনিক ও প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা	• কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত • কমিটির কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব • প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তার ওপর নির্ভরশীলতা • সাচিবিক সহায়তায় ঘাটতি (জনবল, দক্ষতা, পরিকল্পনা) • সুপারিশ বাস্তবায়নে নেতিবাচক অবস্থা • জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি • তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি	• সরকারের জবাবদিহি প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিশ্চিত না হওয়া • সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণের দূরত্ব তৈরি • সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা ব্যাহত

৬. সুপারিশ

১. সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে সাক্ষী হাজিরা, সাক্ষ্য প্রদান ও দলিলপত্র দেওয়ায় বাধ্য করার ক্ষমতা কমিটিকে দিতে হবে।

২. সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি সংশোধন করে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করতে হবে :

   (ক) সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে।

   (খ) কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করার এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থসংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণসাপেক্ষে ওই সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে।

   (গ) বর্তমান বা আগের কোনো মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বা সদস্যপদ না দেওয়ার বিধান করতে হবে।

   (ঘ) কমিটিতে সহসভাপতির পদ প্রবর্তন করতে হবে।

   (ঙ) স্থায়ী কমিটিগুলোর অন্তত ৫০ শতাংশ কমিটিতে, বিশেষ করে আর্থিক কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।

   (চ) সংসদে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন করার বিধান করতে হবে।

   (ছ) প্রাক-বাজেট আলোচনার জন্য অর্থবিল অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

   (জ) গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, যেমন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল বিষয় ছাড়া সাধারণভাবে কমিটির সভা সংসদ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে।

   (ঝ) কমিটি সভায় কোনো সদস্যের অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক করতে হবে।

৩. প্রতিটি কমিটিকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্ধারণ করে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতেই তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে।

৪. কমিটির কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং সব কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সংযোগ কমিটি গঠন করতে হবে।

৫. কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে লিখিতভাবে কমিটিকে জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী সভা-পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭. কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকভিত্তিক (উপস্থিতি, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, তলব ও সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি) অভিন্ন ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে।

৮. কমিটির কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং এ খাতে (গণশুনানি, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ) পৃথক ও সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে।

৯. সংসদ সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে।

১০. কমিটির আলোচ্যসূচি নির্ধারণে সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিটিকে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা করার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের অধিক সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. সভার আগে সভাপতি ও সদস্যের প্রস্তুতির জন্য কমিটি শাখার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী সভার আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্যসংবলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরবরাহ করতে হবে।

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা*

শাহজাদা এম আকরাম

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার মূলকাজ আইন প্রণয়ন করা, সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা, কমিটির শুনানির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়নে সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকে এবং এই প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে।

১৯৯১ সালে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী সংসদগুলো বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয়নি বলে দেখা যায়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদ কার্যকর করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ছিল। তবে নবম সংসদ গঠনের পর থেকে পরবর্তী তিন বছরে সংসদ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব প্রত্যাশিত পর্যায়ে পালন করছেন না বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এ ছাড়া সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম এবং অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয় এবং টিআইবি কর্তৃক মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধানে দেখা যায় নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সংসদ সদস্যরা ইতিবাচক কর্মকাণ্ডেও জড়িত রয়েছেন। তবে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের আনুপাতিক হার পত্রিকায় প্রকাশিত হারের চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর ইতিমধ্যে বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন হলেও সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর গবেষণার অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্দেশ্যে টিআইবির নিয়মিত গবেষণার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করার প্রয়াস রয়েছে। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনার কারণ বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সবগুলো রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে দুটি অন্যতম প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা অন্যতম ও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

* ২০১২ সালের ১৪ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. সংসদ সদস্য-সংক্রান্ত আইনিকাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা;

২. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম চিহ্নিত করা এবং

৩. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর কারণ পর্যালোচনা করা।

ইতিবাচক কার্যক্রম হিসেবে বোঝানো হয়েছে যেসব কাজের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, স্থানীয় সমস্যার সমাধান, সাধারণ জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিকভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন হয়েছে সে ধরনের কার্যক্রম। অন্যদিকে নেতিবাচক কার্যক্রম বলতে সংসদ সদস্যের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার এখতিয়ারের বাইরের কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ হয়েছে।

গবেষণাটি প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। সংসদে অংশগ্রহণ-সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনার ক্ষেত্রে টিআইবির পার্লামেন্টওয়াচ প্রতিবেদন থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সংসদের বাইরের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য জানুয়ারি ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নবম সংসদের ১৮১ জন সদস্য (সংসদ সদস্যদের ৫১ দশমিক ৭ শতাংশ) সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের খুব সামান্য অংশই প্রতিবাদলিপি দিয়েছেন বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত বা প্রেস কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রকাশিত এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে দল-নিরপেক্ষ এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যের ওপর তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়।

একটি জেলায় অবস্থিত আসনগুলোকে একটি গুচ্ছ ধরে সারা দেশের সাতটি বিভাগের ৪২টি জেলা বাছাই করা হয়, যেখানে মোট আসনসংখ্যা ২২০। এই ৪২টি জেলায় ৪৪টি দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ৬০০ জন আলোচক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ছিলেন স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের কর্মী। এসব দলগত আলোচনায় কোন আসনগুলোর সদস্যদের ওপর অলোচনা হবে তা সংশ্লিষ্ট আলোচকরা নির্ধারণ করেন এবং যেসব সংসদ সদস্যের ওপর কোনো তথ্য আলোচকদের কাছে ছিল না, গবেষণার বিশ্লেষণে সেসব সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এভাবে ২২০টি আসনের মধ্য থেকে ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা হয়, এবং আলোচকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য ও মতামত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য,

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংসদ সদস্যদের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের যথার্থতা যাচাই করা হয়, এবং সম্পূরক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান, সংসদীয় কার্যপ্রণালিবিধি, সংসদ ও সংসদ সদস্য-সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও বিধি, গ্রন্থ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ এবং ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় নবম সংসদের শুরু থেকে ২০১২-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দলগত আলোচনাগুলো ২০১২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়োজিত হয়।

উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের বিশ্লেষণ নবম সংসদের সব সদস্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম। এ ছাড়া এটি শুধু বিশ্লেষণমূলক, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তমূলক নয়। টিআইবি ও সামাজিক গবেষণার নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামকরণও এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়।

২. সংসদ সদস্য-সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারসহ সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন রয়েছে। সংসদ কীভাবে তার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং সংসদ সদস্যদের এতে কী ভূমিকা থাকবে, সেজন্য রয়েছে সংসদীয় কার্যপ্রণালিবিধি। এ ছাড়া সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী হিসেবে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, এবং ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়া-সংক্রান্ত আইনের জন্য রয়েছে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' এবং 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯'।

২.১ সংসদ সদস্য-সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা

সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হলেও সংসদ সদস্য হিসেবে প্রকাশ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। সংসদ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য কোনো আচরণবিধি নেই। উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা আইনগতভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সংসদের সদস্যপদ বাতিল হবে। অন্যদিকে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহি করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

সারণি ১ : সংসদ সদস্য-সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা

বিষয়	আইনগত বিধিবিধান	আইনগত সীমাবদ্ধতা
আর্থিক তথ্য (আয়, ব্যয়, সম্পদের বিবরণী) প্রকাশ	▪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক	▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
বিল, কর ও ঋণ-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	▪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিল, কর ও ঋণ-সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে প্রদান করা বাধ্যতামূলক, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে প্রকাশ করবে	▪ কালোটাকা সাদা করেছেন কি না এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	▪ সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হওয়ার আগে কোনো প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ আছে কি না, তা যাচাই করতে হবে (কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী)	▪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ওপর সুনির্দিষ্ট আইন নেই
ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	▪ প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক	▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব প্রদান	▪ নির্বাচনের পরে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক, যা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করার কথা	▪ দাখিলকৃত হিসাব যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতা ও ব্যবস্থা নেই
নির্বাচনী আচরণবিধি	▪ সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি রয়েছে, যা ভঙ্গের ফলে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে	▪ শাস্তির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার অভাব রয়েছে
সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি	▪ সংসদে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে	▪ আচরণবিধি নেই
সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার	▪ উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টা করার মাধ্যমে এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট	▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নের জন্য এটি প্রতিবন্ধক
সংসদে অংশগ্রহণ	▪ সংসদ অধিবেশনে ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত অনুপস্থিতি অনুমোদিত	▪ স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
দলের কাছে জবাবদিহি	▪ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সদস্যপদ বাতিল হবে	▪ জনস্বার্থবিরোধী আইন পাসের বিরোধিতা করা বা নিজের দলের সমালোচনা করা সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না
জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা		▪ পাঁচ বছর পর নির্বাচন ছাড়া জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই

৩. সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা

৩.১ সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৬৭ শতাংশ। সংসদ সদস্যদের দেরিতে উপস্থিতির কারণে নিয়মিত কোরাম-সংকট দেখা যায়। নবম সংসদের প্রথম থেকে একাদশ অধিবেশন পর্যন্ত (২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে ২০১১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত) কোরাম-সংকটের মোট সময় ৭,৭৮৫ মিনিট, যার আর্থিক মূল্য ৩২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা।[৫৬] প্রধান বিরোধী দলের ধারাবাহিক সংসদ বর্জনের কারণে বিরোধী দলের সব সদস্য ২৫ শতাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ২৫৪ দিনের মধ্যে বিরোধী দল উপস্থিত ছিল ৫৪ দিন (মোট কার্যদিবসের ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ)।[৫৭]

[৫৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ জানুয়ারি ২০১২। টিআইবির পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড়ে ৪২ হাজার টাকা খরচ ধরে এই আর্থিক মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে।

[৫৭] *প্রাগুক্ত*।

নবম সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে দেখা যায় অধিবেশনের মোট সময়ের মাত্র ৯ দশমিক ২ শতাংশ আইন প্রণয়নে ব্যয় হয়, এবং এর ২৭ শতাংশ বিভিন্ন বিলের ওপর আপত্তি ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনার ওপর ব্যয় হয়। বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলি ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া মূল বিষয়ে বিলের ওপর সরকারি দলের সদস্যদের আপত্তি ও সংশোধনী প্রস্তাব দিতে আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে সংসদ বর্জনের কারণে এই প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল ন্যূনতম। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। একজন সদস্য বেসরকারি বিল হিসেবে ‘সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯’ উত্থাপন করেন, যা এখনো আইন হিসেবে প্রণীত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ সময় ব্যয় হয়, যা সরকারের জবাবদিহির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে বিভিন্ন আলোচনায় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ব্যাপক সমালোচনা করেন। তবে মন্ত্রীদের বিব্রতকর প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার প্রবণতা ছিল। রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়েও সংসদে কোনো আলোচনা হয়নি। প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্যরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন বলে দেখা যায়। তবে আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ সদস্যরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা নিজ দলের নেতার প্রশংসা, বিরোধী দলের নেতার সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন।

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত হওয়ার পর থেকে কমিটিগুলো সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত ৬৪১টি বৈঠকে নয় শতাধিক সুপারিশ করে, যার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলে জানা যায়। স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অন্যতম একটি ইতিবাচক দিক।

৩.২ সংসদ সদস্যদের সংসদের বাইরের কার্যক্রম

গবেষণায় আলোচিত ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সংসদ সদস্য ১৪১ জন (৯৪ দশমিক ৬ শতাংশ) ও নারী সদস্য আটজন (৫ দশমিক ৪ শতাংশ); এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ১৩৬ (৯১ দশমিক ৩ শতাংশ, যা সরকারদলীয় মোট সদস্যের ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ) ও বিরোধীদলীয় ১৩ জন (৮ দশমিক ৭ শতাংশ)। সরকারদলীয় সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ২৭ জন (১৮ দশমিক ১ শতাংশ)। দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম এবং নেতিবাচক কর্মকাণ্ড।

৩.২.১ সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ কোনো না-কোনো ধরনের ইতিবাচক

কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। এদের মধ্যে নারী সংসদ সদস্য ছয়জন, মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ১৯ জন এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য পাঁচজন।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান রাখা সদস্যরা (৩৫ শতাংশ) নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, ভূমি বরাদ্দ, অনুদান বরাদ্দ, বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ, চরাঞ্চলে চিকিৎসাসেবা, নতুন কোর্স চালু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ (এমপিওভুক্তি) ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় নিজ আসনে অবদান রাখছেন। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ বা তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের (৩১ দশমিক ৩ শতাংশ) বেশির ভাগ রাস্তা, সেতু নির্মাণ বা সংস্কার প্রকল্প অনুমোদন, তদারকি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেলসড়ক উন্নয়ন ইত্যাদি উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সংসদ সদস্যদের (১৮ দশমিক ৮ শতাংশ) গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ততা দূর করা, নদীভাঙন রোধ, চরমপন্থী দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পাটকল চালু, হাওর এলাকায় ডুবন্ত রাস্তা তৈরির উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কার্যক্রমের (১৭ দশমিক ৫ শতাংশ) মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান, পরিবেশ রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, বিরোধীদলীয় ১৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে আটজনেরই কোনো ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রম দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে দলগত আলোচনাগুলোতে একটি জেলায় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্যকে দায়ী করা হয়।

চিত্র ১ : সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম (n=৮০) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

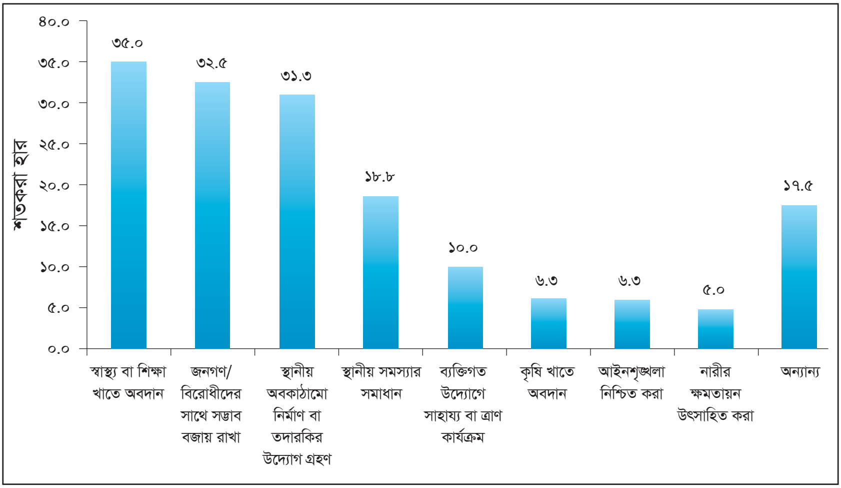

৩.২.২ *সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কার্যক্রম*

দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে সংসদ সদস্যদের ৯৭ শতাংশ বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত দেখা যায়। নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িতদের মধ্যে নারী সদস্য সাতজন, ২৭ জন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর সবাই এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য ১২ জন।

চিত্র ২ : সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ধরন (n=১৪৪) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

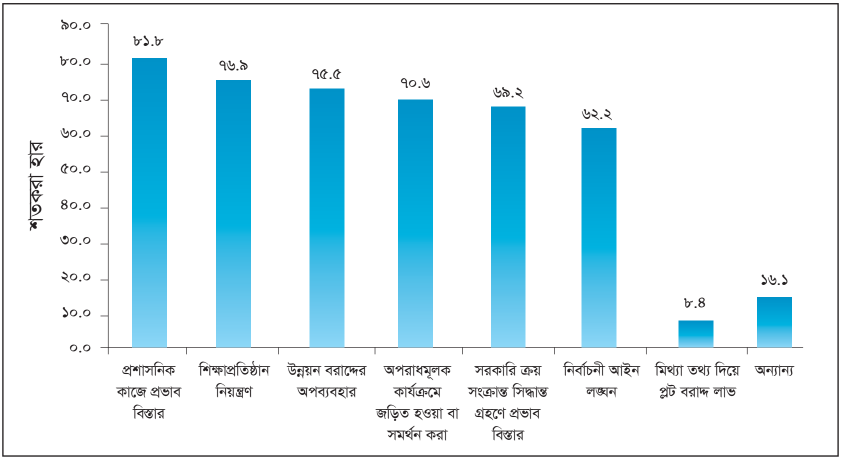

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৮১ দশমিক ৮ শতাংশ স্থানীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি করেন। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে খুব কম ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে, আবার পাল্টা মামলাও করা হয়েছে বলে জানা যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি করে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের চাপে।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি নিয়ন্ত্রণ ও সংসদ সদস্যের নিজের পছন্দের সদস্য নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া, কমিশনের বিনিময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বরাদ্দের অপব্যবহার, বরাদ্দ পেতে দুর্নীতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব অনিয়ম করতে গিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭৫ দশমিক ৫ শতাংশ স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন বরাদ্দ নিজের কাজে ব্যবহার করেন। এ ধরনের ঘটনার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার বা তদারকি না করা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধা নেওয়া, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলের নেতা-কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমিশন আদায় করা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সদস্যরা প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে প্রভাব সৃষ্টি, ভুয়া প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ, টিআর-কাবিখা-কাবিটা বিতরণ ও ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করেন। দেখা যায়, উন্নয়ন বরাদ্দ অপব্যবহারকারী সংসদ সদস্যদের ৭৮ দশমিক ৭ শতাংশ এসব বরাদ্দ অনুমোদন দিতে গিয়ে কমিশন আদায় করেন। কমিশনের হার কমপক্ষে ৫ শতাংশ। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে বেশি কমিশন দিতে পারে, সে-ই কাজ পায়, দল এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির সাথে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ, দখল (সরকারি খাস জমি, নদী, খাল, জলমহাল, পুকুর), চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এসব সদস্যের ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ নিজেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা এসব অপরাধের সাথে জড়িত। দেখা যায় এসব সংসদ সদস্যের মাত্র ২৪ দশমিক ১ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মামলা করার সাহস পায় না, অথবা সংসদ সদস্যদের প্রভাব এত বেশি যে তাদের অনুমতি ছাড়া থানা মামলা নেয় না।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৬৯ দশমিক ২ শতাংশ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব সদস্যের ৭১ দশমিক ৭ শতাংশের হয় নিজের অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অথবা অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে ঠিকাদারি ব্যবসা পরিচালনা করেন। প্রায় ৮৯ শতাংশের ক্ষেত্রে একটি আসনের উন্নয়নমূলক কাজ পান ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী; বাকি ক্ষেত্রেও কমিশনের বিনিময়ে কাজ দেওয়া হয়। দরপত্র কিনতে বা জমা দিতে বাধা দেওয়া, সমঝোতার মাধ্যমে কাজ বণ্টন, কমিশনের বিনিময়ে কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৬২ দশমিক ২ শতাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে প্রার্থীকে মৌখিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া, দলীয়ভাবে সমর্থন, অর্থের বিনিময়ে সমর্থন, নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ ঢাকা শহরে নিজের বা স্ত্রীর নামে একাধিক জমি ও ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা হলফনামার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন।

চিত্র ৩ : সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা (স্কোর সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০)

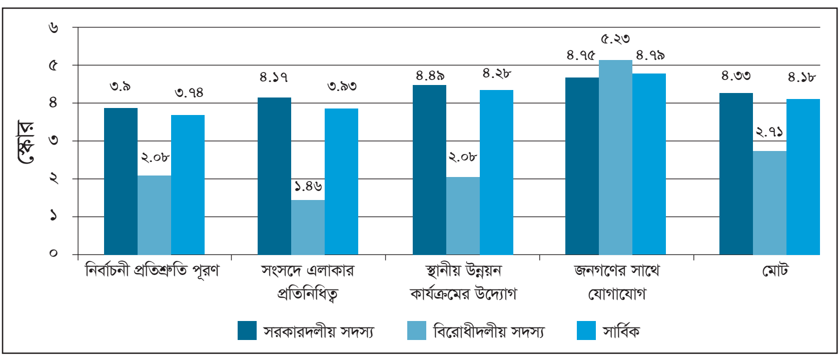

৩.২.৩ *সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে জনগণের সন্তুষ্টির মাত্রা*

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে চারটি নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে সন্তুষ্টির মাত্রা জানতে চাওয়া হয়। সন্তুষ্টির সর্বনিম্ন মান ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০ ধরে এতে সার্বিকভাবে স্কোর আসে ৪ দশমিক ১৮। এতে দেখা যায় বিরোধীদলীয় সদস্যরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ, সংসদে এলাকার প্রতিনিধিত্ব বা স্থানীয় কার্যক্রমের উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ৬৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ সংসদ সদস্য ৫-এর নিচে স্কোর পেয়েছেন, যেখানে মাত্র ৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ ৭ দশমিক ৬ বা তার বেশি স্কোর পেয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমান বেশির ভাগ সংসদ সদস্যের কার্যক্রম নিয়ে জনগণ সন্তুষ্ট নয় বলে ধরা যায়।

৪. সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

৪.১ সংসদ সদস্যপদ 'আয়ের উৎস' হিসেবে ব্যবহার

বর্তমান সরকার গঠনকারী দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনের আগের সাত বছর রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে ছিলেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন সংসদ সদস্যরা। এ ধরনের স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দান পরবর্তী নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য এক ধরনের বিনিয়োগও বটে।

৪.২ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সংসদ সদস্যরা শুধু দলের কাছে দায়বদ্ধ। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়বদ্ধতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে।
- বিভিন্ন আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, আয়কর, ঋণ, অপ্রদর্শিত অর্থ) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার) প্রকাশের কোনো আইনি বিধান না থাকার ফলে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সংসদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনগণের কাছে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ততা, মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও প্রভাব আইনগতভাবে স্বীকৃত থাকার কারণে উপজেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এর ফলে একদিকে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না, অন্যদিকে এটি সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সুযোগ, যার অপব্যবহার করার সুযোগ নেন অনেক সদস্য।
- কোনো সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন বা সংসদ) এখতিয়ার সুস্পষ্ট নয়। ফলে এ ধরনের পরিস্থিতির সুযোগে অভিযুক্ত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো উদাহরণ তৈরি হচ্ছে না।
- সংসদীয় কার্যপ্রণালিবিধি এবং বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ট্রেজারি

বেঞ্চের (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী) একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ করা যায়। এ কারণে ব্যাকবেঞ্চার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে সীমিত। আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্তির কারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত।

৪.৩ দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি

সবগুলো বৃহৎ রাজনৈতিক দলে স্থানীয় পর্যায়ে দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়া, সম্মেলন না হওয়া, পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। এতে একদিকে সংসদ সদস্যরা নিজ দলের সমালোচনার জন্য দলের উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে অসহনশীল আচরণ পেয়ে থাকেন এবং অন্যদিকে বিরোধী দলের প্রতি অসহনশীল ও নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়।

৪.৪ 'শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি'র (culture of impunity) বিকাশ

নেতিবাচক কাজে জড়িত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে 'শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি' বিকশিত হয়েছে, যার ফলে সংসদ সদস্যরা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ছেন না।

চিত্র ৪ : সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণ

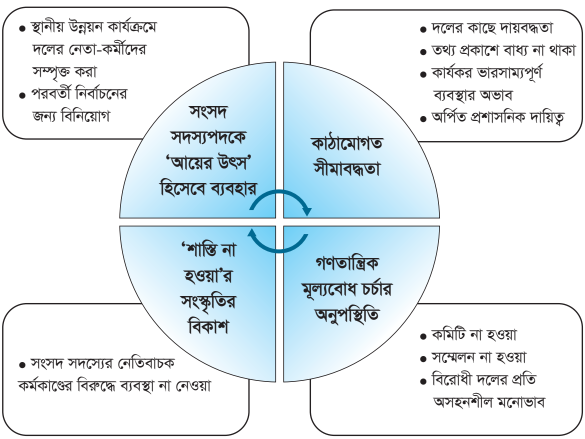

৫. সুপারিশ

৫.১ সংসদে কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানো

১. সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে যেন তারা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব আরও আন্তরিকতার সাথে পালন করতে পারেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন থেকে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে।

২. সংসদ বর্জন আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান ৯০ দিনের অনুমোদন কমিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং একটানা সাত দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. বিরোধী দলের কার্যকর এবং ন্যায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, দল থেকে ডেপুটি স্পিকারের পদত্যাগ এবং পরবর্তী নির্বাচনে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্তত ৫০ শতাংশ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে।

৪. নিজ দল থেকে স্পিকারের পদত্যাগ এবং পরবর্তী নির্বাচনে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে।

৫. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব, জাতীয় বাজেট এবং জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কিছু বিষয় ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

৫.২ নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা

৬. সব রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বিকশিত করতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপিত 'আচরণবিধি' বিল আইনে পরিণত করতে হবে।

৭. সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের নিজ রাজনৈতিক দল থেকেও শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে। বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংসদ সদস্যদের দল থেকে বহিষ্কার এবং পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। প্রত্যাশিত পর্যায়ে কাজ না করার জন্য সংসদ সদস্যকে প্রত্যাহার (recall) বা বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা (special meeting) করার বিধান করতে হবে।

৮. সংসদ সদস্যদের আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ, আয়কর ইত্যাদি) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার ইত্যাদি) নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে জনগণ যেন তথ্য পেতে পারে, তার জন্য তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করতে হবে। সব সংসদ সদস্যের সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

৯. সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং এ কাজটি করতে হবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর আগে থেকেই। নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীদের সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে যেন জনগণ তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ কাজে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের সদস্য ও প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকেও উদ্যোগ নিতে হবে।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যেতে পারে, যেখানে খোলামেলাভাবে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণ জানতে পারবে এবং মতামত দিতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকরাম, শম, দাস, সদ, মনজুর-ই-খোদা, শারমীন, ন ও শারমিন, র ২০১০, *জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা*, টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, দাস, সদ, ও মাহমুদ, ত ২০০৮, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা : জনগণের প্রত্যাশা*, টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, ও দাস, সদ ২০০৭, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা : স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী-বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ', টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, ও দাস, সদ ২০০৯, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরীক্ষা : প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ*, টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, দাস, সদ, আফরোজ, ফ ও শারমিন, র ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি : অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, টিআইবি, ঢাকা।

জাহান, র ২০১১, 'বাংলাদেশের সংসদ : প্রতিনিধিত্ব ও দায়বদ্ধতা', ২০১১ সালের অক্টোবরে সিপিডির সংলাপে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

নজরুল, আ ২০১২, 'মন্ত্রীরা কখনো দুর্নীতি করেন না', দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জুন।

ফিরোজ, জ ২০০৩, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে : বাংলদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মজুমদার, বআ, ২০০৯, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*, আাগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহমুদ, ত ২০০৫, *করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট ২০০৪*, টিআইবি, ঢাকা।

মাহমুদ, ত ২০০৬, *করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট ২০০৫*, টিআইবি, ঢাকা।

মাহমুদ, ত ২০০৭, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, টিআইবি, ঢাকা।

রোজেটি, জ, আফরোজ, ফ ও আকতার, ম ২০১২, 'পার্লামেন্টওয়াচ : নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন', টিআইবি, ঢাকা।

হাসান উজ্জামান, আম ২০০৬, 'বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা', জাহাঙ্গীর, ম (সম্পাদিত), গণতন্ত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Besley, T and Larcinese, V 2005, *Working or Shirking? A Closer Look at MPs' Expenses and Parliamentary Attendance,* August.

'Codes of Conduct for Parliamentarians', <http://www.corisweb.org/> (accessed on 4 January 2007)

Ashraf, MA 2001, *Ethical Standards of Parliamentarians,* Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka.

Khemani, S 2001, *Decentralization and Accountability: Are Voters More Vigilant in Local than National Elections?,* Policy Research Working Paper 2557, Development Research Group, The World Bank, Washington.

Keefer, P and Vlaicu, R (undated), *Democracy, Credibility and Clientelism,* Development Research Group, Policy Research Working Paper 3472, The World Bank, Washington.

Liton, S 2012, 'Image of JS: Guilty, Who?', *The Daily Star,* 5 June.

Krishna, A 2002, "Seizing the Middle Ground: New Political Entrepreneurs in India" Mimeo, Department of Public Policy, Duke University.

McLean, I and McMillan, A (ed) 2006, *The Concise Dictionary of Politics,* Oxford University Press, New Delhi.

Mollah, MAH (undated), 'Good Governance in Bangladesh: Role of Parliament', Dept of Public Administration, University of Rajshahi.

Murray, Senator L 2000, 'MPs, Political Parties and Parliamentary Democracy', *isuma,* Volume 1 N 2, Autumn.

Norris, P 2004, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit.

Rahman, J 2009, 'How Devolution Can Change Our Politics', *Forum,* Volume 4, Issue 3, March. http://www.thedailystar.net/forum/2009/march/devolution.htm (accessed on 8 October 2012)

Reynolds, A, Reilly, B, & Ellis, A 2005, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook,* International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm.

Stapenhurst, R and Pelizzo, R 2006, 'Legislative Ethics and Codes of Conduct', in Stapenhurst, R, Johnston, N and Pelizzo, R (ed.), *The Role of Parliament in Curbing Corruption,* World Bank Institute, Washington.

Wilder, A 1999, *The Pakistani Voter: Electoral Politics and Voting Behavior in the Punjab,* Oxford University Press, Karachi.

বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা : প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা*

রুমানা শারমিন ও জুলিয়েট রোজেটি

> *Elections are one of the basic pillars of democracy and central to the process of democratic political participation...Elections serve as the basic mechanism for both selecting and replacing ruling elites and for providing a regular and systematic succession in government.*(Akhter, MY, 2001: 3)

গণতন্ত্রচর্চায় অন্যতম এক পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর অপরিহার্য। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আগামী দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান কার অধীনে হবে, সে বিষয়েও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারের প্রস্তাবিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে না এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চ্যালেঞ্জ-সম্পর্কিত গবেষণা ও এর ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সকলের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার বিবেচনার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করে এই কার্যপত্রটি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

মূলত গুণগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করে এ কার্যপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ, আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছ থেকে চেকলিস্টের সাহায্যে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই ও ওয়েবসাইট থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই কার্যপত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনকালীন সরকারকাঠামো বিশ্লেষণ, নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন আলোচনা, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে প্রচলিত কাঠামোগুলোর কার্যকরতা বিশ্লেষণ, নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের যৌক্তিকতা এবং বর্তমান সংবিধান অনুসারে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

* ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন যে নামকরণই করা হোক না কেন উভয় সরকারই কিছু নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, যাতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারে (পিআইএলডিটি, ২০০৬: ৬)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নির্বাচনকালীন সরকারকে 'অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার' এবং 'নির্দলীয় ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' এ দুটি পৃথক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান কার্যপত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলতে মূলত অনির্বাচিত ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকার এবং 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' বলতে নির্বাচিত ও দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

ভারতে সংসদ বিলুপ্তির পর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওই সরকারই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। তাদের অধীনে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়াতে পরবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দল সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে পাকিস্তানে যে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা কাদের নিয়ে গঠিত হবে, সে বিষয়টি সব দল মিলে ঠিক করে। অন্যদিকে নেপালে ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ চারটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়েছে, যারা নির্বাচনকালীন সরকারকে নির্বাচন-উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য যাবতীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দেবে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ২০ বছর শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর হয়নি। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (রশিদ, ২০০১: ৩৫৭-৩৭৩)। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দেওয়া হয় ও দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। পঞ্চম সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর সংসদ ভেঙে দিয়ে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দলীয় সরকারের অধীনে একদলীয় ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারের অধীনে শুধু ক্ষমতাসীন দলের অংশগ্রহণে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনের ফলাফল কোনো মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন পাস করা হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সর্বশেষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং 'জরুরি অবস্থা' জারি হয় ও সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে, যা প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়।

২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারি দায়েরকৃত ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে করা রিটের রায় ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট ঘোষিত হয়, যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বৈধতা

দেওয়া হয়। তবে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ১০ মে সংক্ষিপ্ত রায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণা করেন আপিল বিভাগ, যার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর (নজরুল, ২০১২)। ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

বর্তমানে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার দুই ধরনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ ও ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় প্রশাসন তুলনামূলকভাবে প্রভাবমুক্ত থেকে অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পেরেছে বিধায় ভোটারের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়;[৫৮] এ সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলকভাবে সফল; অধিকাংশ সময়ে এ সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদগুলোর মেয়াদ পূর্ণ হতে দেখা যায় (নজরুল, ২০১২ ও ২০১৩)। তবে সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় শক্তি হিসেবে বাংলাদেশে এক-এগারোর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ব চালানোর সুযোগ পেয়ে যায়। বাংলাদেশে কোনো কোনো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক এ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং বিতর্কিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ২০০৭-০৮ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনস্বার্থের বিপরীতে গিয়ে এখতিয়ারবহির্ভূত কিছু বিতর্কিত পদক্ষেপ নেয়, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান; যেমন, বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। এ ছাড়া, এ ব্যবস্থায় বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বা পদোন্নতি এবং গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, যেসব দেশে অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারব্যবস্থার অধীনে সব মহলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এ ব্যবস্থার সপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় বলে গণতন্ত্রের চেতনা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সংগতিপূর্ণ; আদর্শ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে আলোচনার সুযোগ থাকে বলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহিষ্ণুতা সুদৃঢ় হয়; রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আস্থার কারণে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে বলে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়ক, যা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম শর্ত। তবে বাংলাদেশে দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে এ ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা পাওয়া যায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্বীয় পদে বহাল থেকে নির্বাচন পরিচালনা

[৫৮] ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ৫৫ দশমিক ৩১, ৫১ দশমিক ২৯, ৬৬ দশমিক ৩১ ও ৫১ দশমিক ৮১ শতাংশ। ১৯৯১ সালের নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৬ সালে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ২৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ৭৪ দশমিক ৯৬, ৭৫ দশমিক ৫৯ ও ৮০ দশমিক ৮৮ শতাংশ। উৎস : আহমদ ও সালেহ (২০০৯) ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

করেন বলে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয় এবং বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নিতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে (আখতার, ২০০১); নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং অফিসার ও প্রার্থী অপহরণ, ভোটার উপস্থিতি হ্রাসের অভিজ্ঞতা দেখা যায় (আখতার, ২০০১: ১৩২ ও ১৬৫); ক্ষমতাসীন সরকারের সদস্যদের নিয়েই যেহেতু এ সরকার গঠিত হয়, ফলে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়; ক্ষমতাসীনদের অধীনে ১৯৯৬ (ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন) সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গঠিত সংসদ ছিল স্বল্প মেয়াদের।[৫৭]

অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারব্যবস্থার পক্ষে সরকারি দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে যুক্তি :

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দায়িত্বে থাকবেন কিন্তু কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব থাকবে না। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং উত্তরসূরি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবেন, যা অন্যান্য সংসদ সদস্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে 'ওয়ান ইলেভেন'-এর মতো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি অগণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ তৈরি হয়, যা বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারব্যবস্থায় রহিত করা হয়েছে।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী বলে দাবি করা হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দাবির পক্ষে বিরোধী দলের যুক্তি :

- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হবে, যেখানে নির্বাচনী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
- নির্বাচন কমিশনের ওপর বিরোধী দলের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আস্থাবোধ করবে না।
- সরকারদলীয় মন্ত্রিপরিষদকেই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি।
- প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয়করণ হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে সংসদ বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব।

[৫৭] উল্লেখ্য, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯৬-এর ৩০ মার্চ। সূত্র : রশিদ (২০০১), ফিরোজ (২০০৩: ২৩), নজরুল (২০১৩)।

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন-সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে নির্বাচনের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি ছিল মূলত তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের।

পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী দশম সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ :

সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; সংসদ বহাল রেখে অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে;[৬০] প্রধানমন্ত্রী কোনো কারণে পদত্যাগ করলে বা আস্থা হারালে নির্দলীয় বা অনির্বাচিত কোনো ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই; সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ওই সংসদেরই সদস্যরা নির্বাচনকালীন সরকারে বহাল থাকবেন; দশম সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নবম সংসদের সদস্যদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না; সংসদ ভাঙার বা বিলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া কোনোভাবেই রাষ্ট্রপতির কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।[৬১]

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও কার্যকরতা বিশ্লেষণ করে এবং উভয় জোটের অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দশম সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যায় :

- প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা সুস্পষ্ট করা হয়নি।
- যারা এ সরকার পরিচালনায় থাকবেন, তাদের এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি।
- সবার জন্য অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ফলে বিরোধীদলীয় জোটের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
- নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নেই।
- সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ওই আসনের প্রতিনিধি হয়ে পরবর্তী নির্বাচনে একই আসনে বা অন্য কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে তার ফলাফল এবং অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেই সংসদে আইন প্রণয়ন করার সুযোগ থাকে, যার ফলে নির্বাচন ও তার ফলাফল প্রভাবিত করার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার সংসদে রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২৪), যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংকট তৈরি করতে পারে।

[৬০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১২৩(৩) ও ১২৩(৩)(খ)।

[৬১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৭(২)।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং দুই ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ধরনের পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ প্রয়োজন, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চা ও আচরণ তার জন্য অনুকূল নয়।

২. নির্বাচনী ফলাফল একদিকে প্রভাবিত করা এবং অন্যদিকে গ্রহণ না করার মানসিকতার কারণে নির্বাচনকালীন সরকারের ওপর আস্থার অভাব একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে।

৩. এমন অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা (উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী) বাংলাদেশের জন্য 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'তে পরিণত হয়েছে।

৪. দশম সংসদ নির্বাচনে সব দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

টিআইবি প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা

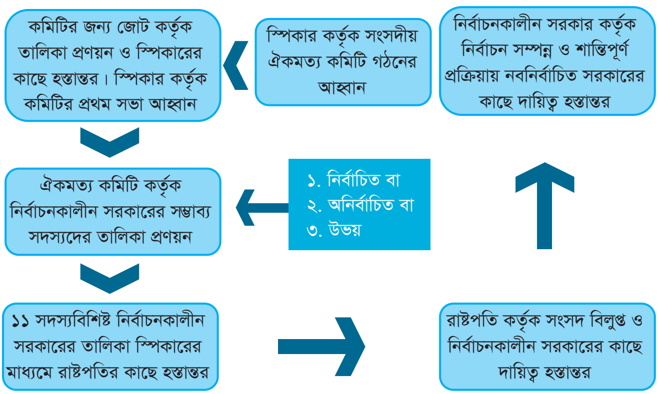

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার অংশগ্রহণে আগামী দশম সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নলিখিত সরকারকাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করছে, যেখানে একটি সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ অন্য সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়া হবে।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি (Parliamentary Consensus Committee) গঠন

কমিটির কাঠামো

➢ বর্তমান সংসদের দুই জোটের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উভয় জোট থেকে সমানসংখ্যক (মোট চার থেকে ছয়জন অথবা উভয় পক্ষের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সংখ্যক) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে।

কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে সদস্য মনোনয়ন দিতে হবে।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

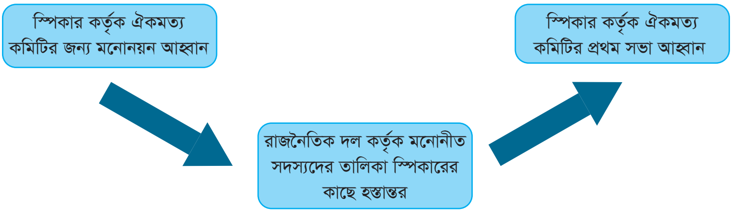

কমিটি গঠনপ্রক্রিয়া

- স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটির জন্য মনোনয়ন আহ্বান।
- রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা স্পিকারের কাছে হস্তান্তর।
- স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটির প্রথম সভা আহ্বান।

সাচিবিক দায়িত্ব

- এই কমিটি কার্যকর থাকাকালীন এর সব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঐকমত্য কমিটির কার্যক্রম

১. নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ মোট ১১ সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এই কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে।

২. সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে উভয় জোটের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে।

৩. কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার বাকি ১০ জন সদস্যের তালিকা চূড়ান্ত করবে।

৪. কমিটি সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে গঠিত হয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করবে, যাতে সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়ে ওই সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারেন।

৫. ঐকমত্য কমিটি আলোচনার মাধ্যমে কমিটির মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য দুজনকে নির্বাচন করবে, যারা যৌথভাবে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা ওই কমিটির মুখপাত্র হিসেবে যে বিষয়গুলো জনস্বার্থে প্রকাশযোগ্য, সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনসমক্ষে (সংবাদ সম্মেলন, ওয়েবসাইট) প্রকাশ করবেন, কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং সার্বিক সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. কমিটির সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আহ্বায়কদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সভাগুলোর সভাপতি নির্ধারিত হবে।

৭. নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের সাথে সাথে কমিটি অকার্যকর হয়ে যাবে।

৮. কমিটির প্রত্যেক সদস্য দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

কমিটি কর্তৃক নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

➢ ***বিকল্প 'ক':***

১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।

২. সরকারপ্রধানের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকারের অন্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।

➢ ***বিকল্প 'খ':***

১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।

২. ওই ১০ জন সদস্যের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান মনোনয়ন-প্রক্রিয়া

➢ নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হবেন একজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তি।

➢ সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে অনধিক তিনজন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি ওই তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের মনোনয়ন-প্রক্রিয়া

❖ নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

✓ ***বিকল্প 'ক':*** উভয় জোট থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত হতে পারবেন।

✓ ***বিকল্প 'খ':*** বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের দলীয় অনুপাতের ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত হবে।[৬২]

---

[৬২] রাজনৈতিক দলভেদে সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের গড় করে দেখা যায়, ওই তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪২ দশমিক ২১ শতাংশ, বিএনপি ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ, জাতীয় পার্টি ১০ দশমিক ১ শতাংশ, জামায়াতে ইসলামী ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ অবশিষ্ট দল ৬ শতাংশ) ভোট পেয়েছে। তথ্যসূত্র : আহমেদ (২০০৪: ৯৫), হাসানুজ্জামান (২০০৯: ৪৯) এবং ডেইলি স্টার, ১ জানুয়ারি ২০০৯।

❖ উপরিউক্ত দুটি বিকল্পের ক্ষেত্রেই সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি কাঠামো বিবেচনা করতে পারে :

- ***বিকল্প 'ক':*** নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মনোনীত করবে।
- ***বিকল্প 'খ':*** নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে পারে।
- ***বিকল্প 'গ':*** অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ওই সরকার গঠন করতে পারে।

কমিটি কর্তৃক নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

বিকল্প 'ক'

১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।
২. সরকারপ্রধানের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকারের অন্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।

বিকল্প 'খ'

১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।
২. ওই ১০ জন সদস্যের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান মনোনয়ন প্রক্রিয়া

- নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হবেন একজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তি।
- সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ঐকমত্যে পৌছাতে না পারলে অনধিক তিনজন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি ওই তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের মনোনয়ন প্রক্রিয়া

বিকল্প 'ক'

উভয় জোট থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত হতে পারবেন

বিকল্প 'খ'

বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের দলীয় অনুপাতের ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত হবেন

উপরিউক্ত দুটি বিকল্পের ক্ষেত্রেই সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি কাঠামো বিবেচনা করতে পারে

বিকল্প 'ক'

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মনোনীত করবে

বিকল্প 'খ'

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে

বিকল্প 'গ'

অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উক্ত সরকার গঠন করতে পারে

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- ❖ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
- ❖ অনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য, জাতীয় পর্যায়ে প্রশংসিত, সৎ, আস্থাভাজন, পেশাগত জীবনে সুখ্যাত এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিবেচনা করতে হবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের এখতিয়ার

- ❑ সরকারের মেয়াদ হবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিন।
- ❑ এই ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। শুধু গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ❑ এই সরকারের কোনো সদস্য দশম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তারা দশম সংসদে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ওই সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সরকারি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।
- ❑ এই সরকার শুধু নির্বাচন-সংক্রান্ত ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক অপরিহার্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। বড় কোনো প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, কূটনৈতিক বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া এবং দ্বিপক্ষীয় বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বৈদেশিক সাহায্যের বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।
- ❑ সরকারপ্রধান নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করবেন।
- ❑ নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধান সব ধরনের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করবেন।

রাষ্ট্রপতির সার্বিক ভূমিকা

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বের পাশাপাশি :

- ✓ সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে অনধিক তিনজন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি ওই তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।
- ✓ ঐকমত্য কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে আহ্বান করবেন।
- ✓ নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিতর্কের সমাধানের প্রয়োজনে ওই সরকারকে পরামর্শ দেবেন।

- ✓ গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ✓ নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সদস্যদের কোনো সদস্যকে অপসারণ বা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- ✓ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটকে সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১. প্রস্তাবিত কাঠামো ও প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হলে রাজনৈতিক দলগুলো একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে।

২. নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রতি সব দলের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩. প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারকাঠামো ও প্রক্রিয়া যদি গৃহীত হয়, তবে দশম সংসদ নির্বাচনসহ পরবর্তী নির্বাচনে তা কার্যকর করার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণভোটের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আখতার, ম ই, ২০০৯, *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমী নির্বাচন*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

করিম, ম র, ২০১২, *২০০৭-৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি।

খান, ম র, ২০১২, 'নির্বাচিত ও অনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর কূটতর্ক', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ অক্টোবর।

হাসানউজ্জামান, আ ম, ২০১৩, 'জবাবদিহি : সংকটমোচনে চাই সংসদের কার্যকর ভূমিকা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি।

হাসানউজ্জামান, আ ম, ২০০৯, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স*, ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নজরুল, আ, ২০১১, 'রায়ে সমাধান নেই, আছে সংকট', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ সেপ্টেম্বর।

ফিরোজ, জ, ২০০৩, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে : বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রহমান, তম, ২০০৯, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা : সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা।

হালিম, আ, ২০১২, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি*, সিসিবি ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ, ২০০১, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

সালেহউদ্দিন, ২০১৩, 'সংবিধান পর্যালোচনা-৩ : আসন শূন্য ঘোষণা না করেই সংসদ নির্বাচন : আগের

মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবনির্বাচিতরা শপথ নিতে পারবেন না', *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৫ জানুয়ারি।

সালেহউদ্দিন, ২০১৩, 'সংবিধান পর্যালোচনা-৫ : যে সরকারই হোক, প্রধানমন্ত্রী হবেন বর্তমান সংসদ থেকেই', *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৭ জানুয়ারি।

সালেহউদ্দিন, ২০১৩, 'সংবিধান পর্যালোচনা-৬ : সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হারালে আগাম নির্বাচনের সুযোগ নেই', *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৮ জানুয়ারি।

আহমদ, শ ও সালেহ আ, ২০০৯, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১৯৯১-২০০৭) : একটি পর্যালোচনা : রাজনীতির চার দশক (সম্পাদিত),* শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

Akhter, MY, 2001, *Electoral Corruption In Bangladesh,* Ashgate Publishing Limited, England, p.137.

Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, 2006, *Background Paper: Caretaker Government during Election: A Comparative Study of Pakistan, Bangladesh and India,* Son Printers, Lahore, p. 6.

Sinha, M A S, 2012, 'Conceptual understanding of caretaker government', *The Financial Express,* 6 May.

Keith, A B, 1952, *British Cabinet System,* London: Stevens.

Mahajan, V D & Chand, S, 1971, *Constitutional history of India, including the nationalist movement;* Brown, Judith 1999, *Modern India: The making of an Asian Democracy,* Oxford University Press, (2nd Edition).

Eicher, P, Alam, Z & Eckstein, J, 2010, 'Election In Bangladesh: 2006-2009, Transforming Failure into Success', UNDP, March.

Nayar, K, 1996, 'Caretaker Government in India Also?', Dhaka Courier, 12 (29-30), 16 February, was Cited in Ahmed, N, 2004, *Non-Party Caretaker Government In Bangladesh,* The University Press Limited.

Karim, W, 2007, *Election under a Caretaker Government: An Empirical Analysis of the October 2001 Parliamentary Election in Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka.

Ahmed, I, 2012, 'Constitutionality of election under party govt', *Daily New Age,* 13 October.

Ahmed, N, 2004, *Non-Party Caretaker Government In Bangladesh,* The University Press Limited.

Nazrul, A, 2013, '15th Amenment: Transition of Power', *The Daily Star,* 17 March.

Ahsan, S B, 2013, 'Through Smooth and Rough Caretaker Terrain', *The Daily Star,* 17 March.

Liton, S, 2012, 'News Analysis: No Change in Politics, Hasina-Khaleda only Swapped Positions', *The Daily Star,* 02 August.

কার্যকর নির্বাচন কমিশন : অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

সাধন কুমার দাস ও শাহজাদা এম আকরাম

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা অপরিহার্য, যেখানে নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, প্রেসিডেন্ট, সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করা এবং সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা।[৬৩] এসব দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আরও কিছু দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে পালন করতে হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে টিআইবি ২০০৬ সালে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ গবেষণা প্রকাশের পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনি সংস্কার সাধিত হয়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ (২০০৯), রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা (২০০৯) এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নে তৃণমূলের অংশগ্রহণ (২০১০)। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. নির্বাচন কমিশন-সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের পর্যালোচনা করা;

২. নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;

৩. নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা;

৪. নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা এবং

৫. নির্বাচন কমিশনের ভবিষ্যৎ করণীয় সুপারিশ করা।

---

* ২০১৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[৬৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৯।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য গুণগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের ঢাকা ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধি, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদমাধ্যমের কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া গবেষণা দলের পক্ষ থেকে চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও একটি পৌরসভার মেয়র নির্বাচনের সময় মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরোক্ষ তথ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানসহ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত নথি এবং সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিষয়সংশ্লিষ্ট সংবাদ ও বিশ্লেষণ।

এ গবেষণার সময়কাল ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত। গবেষণার জন্য ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

২.১ নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কার পর্যালোচনা

২০০৭ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়, যার মধ্যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার শর্ত বৃদ্ধি করা, প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট করা, জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী কেন্দ্র পরিবর্তন ও প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান, একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ পাঁচটি থেকে কমিয়ে তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া, নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ করা, আচরণবিধির মাধ্যমে প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধি করা, 'না' ভোটের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ও নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়োগবিধি জারি করা হয়, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়।

তবে এসব ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের বেশ কিছু দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ-সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়নি। এ ছাড়া বিদ্যমান আইনে নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী কত দিন পর্যন্ত এবং কোন মন্ত্রণালয় বা

বিভাগের কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকবে তা সুনির্দিষ্ট না থাকা, জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না থাকা, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতাজনিত সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা না থাকা, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক দলের আর্থিক হিসাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা না থাকা, তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী প্রচারণাকে আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত না করা, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তির ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও আচরণবিধির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা এবং সংশোধিত সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র না থাকা (নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধিতে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা) ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা এখনো বিদ্যমান।

২.২ নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা

২.২.১ ***নির্বাচন আয়োজন :*** ২০০৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন আয়োজন করে, যার মধ্যে রয়েছে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৩০০টি আসনে); জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন (১৬টি আসনে); জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন (৫০টি আসনে); রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (দুইবার); সিটি করপোরেশন নির্বাচন (১৩টি); পৌরসভা নির্বাচন (২৮৪টি); উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (৪৮১টি) এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (৪,৪৩১টি)। এসব নির্বাচন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব জনবল দিয়ে এসব নির্বাচন আয়োজন করে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করেন।

তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সরকার ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও দুটি সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও দ্বিতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কয়েকটি এলাকায় সহিংস ঘটনা ঘটে।

২.২.২ ***নির্বাচনী আচরণবিধি ও এর প্রয়োগ :*** নির্বাচন কমিশন প্রতিটি স্তরে নির্বাচনের জন্য গুণগত কিছু পরিবর্তন এনে নির্বাচনভিত্তিক আচরণবিধি প্রণয়ন করে, যা মেনে চলার প্রবণতা প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে লক্ষ করা যায়। তবে তারপরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের মধ্যে নির্বাচনী কাজে সরকারি সার্কিট হাউস ও গাড়ি ব্যবহার, রঙিন বিলবোর্ড ব্যবহার, রাস্তার ওপর জনসভার আয়োজন, নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি নির্বাচনী কার্যালয় স্থাপন, তোরণ নির্মাণ, প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার, ভোট কেনার অভিযোগ, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থীকে দলীয়ভাবে সমর্থন ও অর্থের বিনিময়ে সমর্থন দেওয়া উল্লেখযোগ্য। কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে কারণ দর্শানো, জরিমানা ও সতর্কতার নোটিশ দেওয়া হয়। তবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয়তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

২.২.৩ ভোটার তালিকা : নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবম জাতীয় নির্বাচনের জন্য ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যা পরবর্তীকালে বর্তমান কমিশন হালনাগাদ করেছে। হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ নতুন ভোটার ছবিসহ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান ভোটার ৯ কোটি ২১ লাখ ২৯ হাজার ৮৫২ জন (পুরুষ ৪ কোটি ৬২ লাখ ১ হাজার ৮৭১; নারী ৪ কোটি ৫৯ লাখ ২৭ হাজার ৯৮১)। তবে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে কোনো কোনো এলাকায় অনিয়মের (যেমন- প্রতি বাড়িতে না যাওয়া, হালনাগাদের কাজে দীর্ঘসূত্রতা) অভিযোগ পাওয়া যায়।

২.২.৪ নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ : নির্বাচন কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ২০০৮ সালে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ, যা বর্তমান কমিশন ২০১৩ সালে আবার সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য, আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর আগে সর্বশেষ ১৯৮৩ সালে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ২০০৮ সালে ১৩৩টি সংসদীয় আসন গণশুনানির জন্য চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে ৮৪টি আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ বছর ৮৪টি সংসদীয় আসন গণশুনানির জন্য চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে ৫৩টি আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। তবে কয়েকটি নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া আসনপ্রতি ভোটারসংখ্যায় বৈষম্য লক্ষ করা যায়, যেমন- ২৪টি সংসদীয় আসনের ভোটারসংখ্যা চার লাখের ওপরে এবং ১৪টি আসনের ভোটারসংখ্যা দুই লাখের নিচে।

২.২.৫ নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি : নবম জাতীয় নির্বাচনের পর ১৯টি নির্বাচনী মামলার মধ্যে মাত্র চারটির নিষ্পত্তি হয়েছে। তথ্য গোপন করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে তিনজনের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের পর দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার, যার মধ্যে কেবল দুটির নিষ্পত্তি হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

২.২.৬ প্রার্থী ও দলের হিসাব নিরীক্ষা ও তথ্য প্রকাশ : বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য এবং নির্বাচনের পর প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। নির্দিষ্ট সময়ে রিটার্ন জমা দেয়নি এমন ১৪৪ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করে।[৬৪] তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা না দেওয়া প্রার্থীর সংখ্যা প্রকাশ করেনি কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মিতভাবে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করে, তবে আইনে উল্লেখ না থাকায় এ-সংক্রান্ত তথ্য কমিশন প্রকাশ করেনি।

২.৩ নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ

নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে কমিশনের সচিবালয়ের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এজন্য ‘নির্বাচন কমিশন

[৬৪] ২০০৯-এর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

(কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধি, ২০০৯' জারি করা হয়, যার মাধ্যমে কমিশনের সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের পার্থক্য দূর করার জন্য একটি একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা হয়। একটি সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে (মাঠপর্যায়ের নয়জনসহ) ৬১ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ১৫৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণির পাঁচটি, তৃতীয় শ্রেণির ১৫১টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১১৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়; মাঠপর্যায়ে বিভাগীয় নয়টি পদ এবং জেলা পর্যায়ের ১৯টি পদকে উন্নীত করা হয়। এ ছাড়া ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ১৭৪ ও তৃতীয় শ্রেণির ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো কমিশনে নিয়োগ ও পদোন্নতি-সংক্রান্ত জটিলতা বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠতার তালিকা নিয়ে বিতর্কের কারণে পদোন্নতি নিয়ে মামলা করা হয়। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ৮৫টি পদের নিয়োগের বিপরীতে হাইকোর্টে মামলা থাকায় এসব পদে জনবল এখনো শূন্য।

নির্বাচন কমিশনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য, যদিও এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের সমস্যা বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবনের জন্য ঢাকার আগারগাঁওয়ে ২ দশমিক ৩৬ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে (নয়টি আঞ্চলিক, ৫৪টি জেলা ও ৩৮৩টি উপজেলা পর্যায়ে) সার্ভার স্টেশন নির্মাণ করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ৩৭০টির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে সার্ভার স্টেশন ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর বা বন্দোবস্ত কিংবা ব্যবহারে অনুমতি প্রদানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা ও অফিস রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ অপ্রতুল।

নির্বাচনী ও দাপ্তরিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম), ওয়েব ক্যামেরা, এসএমএস প্রবর্তন, মাঠপর্যায় ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার এবং বাংলা ওয়েবসাইট চালু। তবে কমিশনের ওয়েবসাইটে সব তথ্য পাওয়া যায় না, যেমন সাম্প্রতিক নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা, কমিশন আয়োজিত সংলাপের সারাংশ, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন ইত্যাদি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে গৃহীত নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কারের ফলে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এসব সংস্কারের ফলে নির্বাচনী সংস্কৃতির একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, যেখানে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, যার তদারকির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কমিশনের অধীনে নিয়ে আসার ফলে এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও শক্তিশালী হয়েছে। এ ছাড়া প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় বেড়েছে এবং নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৪ নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সরকার (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচিত সরকার), রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার পরোক্ষভাবে নির্বাচন কমিশনের কাজ নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, প্রশাসনিক সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দেওয়া হয়, অন্যদিকে কমিশনের আইন সংস্কারের সুপারিশ আমলে না নেওয়া, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন না করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রশাসনিক প্রভাব ইত্যাদি কমিশনকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের শ্লথগতি একটি উদ্বেগের বিষয়।

কমিশনের কার্যক্রমে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থেকে সহযোগিতার অভাব ছিল। নির্বাচন কমিশনকে এ সময়ে একটি প্রধান দলের আস্থা অর্জনে বেগ পেতে হয়। এই দলের পক্ষ থেকে কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে দলটি কমিশনের সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি। এ ছাড়া কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন পুনর্গঠন এবং নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।

গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের জন্য যেমন সহায়ক ছিল, নির্বাচন কমিশনও তেমনি গণমাধ্যমের কাছে উন্মুক্ত ছিল। একইভাবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচনী আইন সংস্কার ও সার্বিকভাবে নির্বাচনী সংস্কৃতি পরিবর্তনে নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যদিও কোনো কোনো সময়ে নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক ওঠে।

২.৫ বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে নির্বাচন কমিশনের নিচের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা যায়।

২.৫.১ *অগ্রগতি*

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে কমিশনের অধীন নিয়ে আসা এবং আর্থিক স্বাধীনতা কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবল ব্যবস্থাপনার সংস্কার আরেকটি অগ্রগতি। নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচন গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজস্ব ও দক্ষ জনবল ব্যবহার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে। তথ্য প্রকাশের ধারার সূচনা ও বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়ায় সব স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করাও অন্যতম অগ্রগতি।

নির্বাচন-সংক্রান্ত অগ্রগতির মধ্যে নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া সংস্কার এবং বাস্তবায়ন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের তদারকি কাঠামো প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে, যার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সাধারণভাবে আচরণবিধি মেনে চলা এবং নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

২.৫.২ চ্যালেঞ্জ

- **দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা :** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সম্ভাব্য প্রভাব রোধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, যেখানে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সাম্প্রতিক উদ্যোগ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। কমিশনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত রয়েছে; দশম সংসদ নির্বাচনেও জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনে সাম্প্রতিক বিতর্কিত রদবদল ও পদোন্নতির কারণে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর দলীয় প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণবিধি লঙ্ঘন রোধে কমিশনের ভূমিকাও সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ।
- **প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বৃদ্ধি :** নির্বাচন কমিশনের কিছু বিতর্কিত কার্যক্রম ও উদ্যোগ, যেমন বিএনপির সাথে নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টকে (বিএনএফ) নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ, নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিল-সংক্রান্ত ধারা (৯১-ই) বাতিলের সুপারিশ, আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি কমানোর সুপারিশ, দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বাড়ানো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও ইভিএম ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক প্রধান বিরোধী দলের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব :** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব নির্বাচন আয়োজনে কমিশন সরকারের ওপর নির্ভরশীল (নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সহায়তা)।
- **আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ :** বিভিন্ন আইনি সংস্কারের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। ফলে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা, যেমন- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা, নির্বাচনের সময় সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা না থাকা, নির্বাচনী প্রচারণার আওতা ও শুরুর সময় নির্ধারিত না থাকা, নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা করার পদ্ধতি প্রচলন না থাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **আইন প্রয়োগে দৃঢ়তা প্রদর্শন :** নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় রোধ করা কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা :** প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আর্থিক

ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। জনবল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করায় ব্যর্থতার কারণে কমিশনের পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সর্বোপরি, জনগণের আস্থা অর্জন করা নির্বাচন কমিশনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

৩. উপসংহার ও সুপারিশ

নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নির্বাচন কমিশন নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো (সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন, নির্বাচনী প্রস্তুতি, বিদ্যমান আইন প্রয়োগে দৃঢ়তার প্রমাণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা) মোকাবিলা করতে পারলেও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জগুলোর (যেমন- নির্বাচনের সময় সরকারকাঠামো, নির্বাচনের সময় নির্ধারণ, আইনি সংস্কারে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রশাসনিক প্রভাব) ওপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ নেই। সার্বিকভাবে বলা যায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হলো।

ক. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

১. **সবগুলো রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন :** সবগুলো রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নিচের উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।

- নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হয় এমন কোনো বিতর্কিত উদ্যোগ না নেওয়া; বরং শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে নির্বাচনী আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
- কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও কার্যক্রমে সব রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;
- আচরণবিধি সংশোধনের মাধ্যমে দশম সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করা।

২. **নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার :** জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার করতে হবে। দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে কমিশনের কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দিতে হবে।

৩. **নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করা :** ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে।

৪. **নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা :** নির্বাচন কমিশনের যেসব কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করার কথা, যেমন- ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ ইত্যাদি আইন অনুসরণ করে অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কমিশন প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে, বিশেষ করে তার সাফল্য ও

ব্যর্থতার নিরিখে বর্তমান কমিশনের কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও এর বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। একটি পঞ্চবার্ষিকী নির্বাচনী ক্যালেন্ডার তৈরি করে তা অনুসরণ করতে হবে।

৫. **তথ্য প্রকাশ :** নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা-সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত সংলাপের ফলাফল বা সারাংশ, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ সব ধরনের আর্থিক দলিল।

খ. সরকারের ভূমিকা

৬. **প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন :** প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগপদ্ধতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়া, সংখ্যা, অপসারণের পদ্ধতি-সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া হতে হবে দলনিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবগুলো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৭. **আইনি সংস্কার :** নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে :

- নির্বাচনকালীন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
- প্রার্থিতা বাতিল, সংসদ সদস্যপদ বাতিল, ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা;
- সংশোধিত সংবিধানের আলোকে নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই অন্তর্ভুক্ত করা;
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ-সংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা;
- আচরণবিধি লঙ্ঘন-সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা;
- নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘না’ ভোটের পুনঃপ্রচলন করা।

গ. রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮. **সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ :** প্রতিবছর সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের জন্য প্রকাশ করবে।

৯. **রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রকাশ :** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং দলের আয়, ব্যয় ও সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

১০. **সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চা :** রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। তৃণমূল থেকে মনোনীত এবং সৎ, জনগণ-সম্পৃক্ত, জনকল্যাণে নিয়োজিত, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ, কালোটাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

১১. **নির্দলীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচন :** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে দলীয় প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে।

ঘ. নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

১২. **নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ :** নাগরিক সংগঠন কর্তৃক প্রথাগত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচনী-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম, নির্বাচনী অর্থায়ন এবং ব্যয় আইনানুগ ও স্বচ্ছ হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

ঙ. গণমাধ্যমের ভূমিকা

১৩. **নির্বাচনী তথ্য প্রকাশ :** গণমাধ্যমকে নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনী ব্যয় ইত্যাদি-সংক্রান্ত গভীর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকরাম, শম, দাস, সক ও মাহমুদ, ত ২০১২, 'রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', শাহজাদা আকরাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় (তৃতীয় খণ্ড)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আকরাম, শম ও দাস, সক ২০১০, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-প্রক্রিয়া নিরীক্ষা : প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আখতার, মই ২০০৯, *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমী নির্বাচন*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, এপ্রিল ২০১১, *দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা* ২০১১-২০১৩, ঢাকা।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, 'বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জনবিষয়ক প্রতিবেদন', ২৭ জুন ২০১২।

মজুমদার, বআ, ২০০৯, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মজুমদার, বআ (সম্পাদিত), ২০০৮, *সংসদ নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন*, সুজন- সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঢাকা।

রহমান, মম ১৯৮৮, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন*, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রুমানা, শ, আফরোজ, ফ, দাস, সক ও আকরাম, শম ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি : অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

Akram, SM & Das, SK 2006, 'Bangladesh Election Commission', Transparency International Bangladesh, Dhaka.

Akram, SM, Das, SK & Mahmud, T 2010, *Political Financing in Bangladesh,* Transparency International Bangladesh, Dhaka.

Bangladesh Election Commission 2011, *Five-Year Strategic Plan 2011-2016,* Dhaka.

Eicher, P, Alam, Z & Eckstein, J 2010, *Elections in Bangladesh 2006-2009: Transforming Failure into Success,* UNDP, Dhaka.

Election Working Group 2013, 'Observation of the Election Commission Bangladesh (ECB) Voter Registration Process, Phase 4: October - December 2012', Dhaka.

Huda, ATMS 2013, 'Its meaning, attributes and limit: Independence of Bangladesh Election Commission', *The Daily Star,* 17 March.

Hussain, MS 2012, *Electoral Reform in Bangladesh 1972 - 2008,* Palok Publications, Dhaka.

Khan, AA 2013, 'Electoral Challenges in Bangladesh: The choice between the unpalatable and disastrous', *The Daily Star,* 17 March.

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

Asian Network for Free Elections (Anfrel) Foundation 2008, 'Preliminary Report: Bangladesh Election Observation Mission 2008'.

Election Working Group 2008, 'Bangladesh Ninth Parliamentary Election: Election Observation Report'.

International Republican Institute and USAID 2008, 'Exit Poll: Bangladesh Parliamentary Election'.

JANIPOP 2010, 'Election Observation Report on 117 Electoral Constituency Bhola-3'.

JANIPOP 2010, 'Election Observation Report on Chittagong City Corporation Elections'.

National Democratic Institute (NDI) 2008, Statement of The NDI Election Observer Delegation to Bangladesh’s 2008 Parliamentary Elections.

Rupantar 2009, 'Report on 9th Parliament Election Observation'.

The Asia Foundation, Odhikar, International Foundation for Electoral Systems 2009, 'Election Violence Education and Resolution'.

WAVE Foundation 2009, 'Election Observation Report on Bangladesh Ninth Parliamentary Election'.

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০১৫ : প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ*

মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও তাসলিমা আক্তার

১. ভূমিকা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি একটি দেশের আর্থসামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরাসরি ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। এসব নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের যথাযথ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭ সালের ১৫ মে অভিন্ন[৬৬] ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হলেও পরবর্তী সময়ে দুই ভাগে বিভক্ত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত হয় এবং অনির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা সিটি করপোরেশন দুটি পরিচালিত হয়।[৬৭] এভাবে অনির্বাচিত প্রশাসকদের মাধ্যমে সাত বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকা সিটি করপোরেশন পরিচালনা ছিল কার্যত অসাংবিধানিক। তবে সাম্প্রতিক কালের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা এবং তাতে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর মধ্যে সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার সৃষ্টি করে। টিআইবি তার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত সময়ে জাতীয় নির্বাচন-প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর একাধিক গবেষণা পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০১৫ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা, সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী আইনকানুন ও আচরণবিধি কতটুকু পালন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা ও নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

---

* প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপ ২০১৫ সালের ১৮ মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

৬৬ মহাজোট সরকার ২০১১ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকা সিটি করপোরেশকে ভেঙে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিভক্ত করে।

৬৭ ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০১৫) 'সিটি করপোরেশন নির্বাচন : কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগ' *দৈনিক যুগান্তর*, ৬ এপ্রিল।

১.২ গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা, যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে তিন সিটি করপোরেশনের সবগুলো তথা ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২০ দশমিক ৯০ শতাংশ) ওয়ার্ডকে জনসংখ্যা, ভোটারের আকার ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে গবেষণার নমুনা এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ২৮টি ওয়ার্ডই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়ার্ড থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। নমুনা প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সমর্থিত প্রার্থীদের তিনজন করে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে মোট চারজন (দুজন সাধারণ ও দুজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর) করে সর্বমোট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীকে[৬৮] গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

প্রত্যক্ষ তথ্যদাতার মধ্যে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত মেয়র, কাউন্সিলর প্রার্থী, প্রার্থীদের কর্মী, নির্বাচনী এজেন্ট, রাজনৈতিক নেতা, ভোটার ও স্থানীয় জনসাধারণ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য, নির্বাচনী কর্মকর্তা, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিসহ মোট ৮৭২ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট সংবাদ মাধ্যম ও ওয়েবসাইট।

গবেষণার আওতাভুক্ত ঘটনাগুলোর ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়। এই গবেষণায় ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর ২০১৫ সালের ৮ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ তিনটি সিটি করপোরেশনের সব প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় সরকার সিটি করপোরেশন নির্বাচন-প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০১১ সাল পর্যন্ত সংশোধিত)', 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০', 'সিটি করপোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এসব বিধিমালা পর্যালোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে–নির্বাচনে প্রার্থীপ্রতি ব্যয়ের সীমা খাতভিত্তিক (যেমন–পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানারের সংখ্যা) সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকা; প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ও অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না রাখা; নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদের বিধান না

[৬৮] সাধারণ প্রার্থী ৫৬ জন, সংরক্ষিত প্রার্থী ৪৫ জন।

রাখা; প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান উল্লেখ না থাকা; প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান রাখা এবং তাদের ব্যয়সীমার ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম না রাখা ইত্যাদি। এ ছাড়া সিটি করপোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালায় (২০১০) নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্যপ্রযুক্তি যেমন- ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহার ও ব্যয় সম্পর্কে উল্লেখ নেই। সার্বিকভাবে বিদ্যমান আইনিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা কার্যত নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য

গবেষণা নমুনার অন্তর্ভুক্ত নয়জন মেয়র প্রার্থী এবং ৫৬ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী সবাই পুরুষ। মেয়র প্রার্থীদের গড় বয়স ৫৪, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের গড় বয়স যথাক্রমে ৫২ ও ৪৫ বছর। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার কিছুটা বেশি হলেও অর্থাৎ নয়জনের মধ্যে পাঁচজন স্নাতক বা স্নতকোত্তর ডিগ্রিধারী হলেও সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই নিরক্ষর ও স্বশিক্ষিত। পেশাগত দিক থেকে সব মেয়র প্রার্থী হলফনামায় নিজেদের প্রধান পেশা ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন; অপরদিকে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে যথাক্রমে ব্যবসা (৭৩ দশমিক ২ শতাংশ) ও গৃহকর্ম (৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ) উল্লেখ করেছেন। মাসিক আয় হিসেবে মেয়র প্রার্থীদের গড় আয় ২৮ লাখ ৫২ হাজার টাকা; পক্ষান্তরে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীর ক্ষেত্রে গড় মাসিক আয় যথাক্রমে চার লাখ ৯৪ হাজার ও এক লাখ ৬৯ হাজার টাকা। নির্বাচনী হলফনামায় সম্ভাব্য মোট গড় ব্যয় হিসেবে মেয়র, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা যথাক্রমে ৩৩ লাখ ৪৬ হাজার, দুই লাখ ৮৩ হাজার ও তিন লাখ ৪৫ হাজার টাকা উল্লেখ করেছেন। চলমান ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, নয়জনের মধ্যে তিনজন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। এদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৩৭টি মামলা রয়েছে। আর সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৪১ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ১১ দশমিক ১ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান রয়েছে।

২.৩ নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দলীয় সমর্থন পেতে অর্থের লেনদেন : মেয়র পদে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য কোনো কোনো প্রার্থীকে অর্থ দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রার্থীদের সবাইকে ২০ লাখ থেকে ৭ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, কাউন্সিলর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের একাংশ কর্তৃক অর্থ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ও নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লাখ থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকার দুই সিটির সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রেও এক লাখ থেকে আট লাখ টাকা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকার সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও অর্থের পরিমাণ জানা যায়নি।

মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, দলীয় তহবিল, উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন নেতা ও উপদেষ্টাকে প্রার্থী নিজে ও প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ এই অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র প্রার্থী, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের একাংশকে প্রার্থী নিজে ও তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পক্ষ থেকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়

সিটি করপোরেশনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, নয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে একজন বাদে সবাই তাদের ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। উল্লেখ্য, বিধিমালা অনুযায়ী তিন সিটি করপোরেশনের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকা উত্তরে ৫০ লাখ এবং ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রামের জন্য ৩০ লাখ টাকা করে নির্ধারিত। মেয়র প্রার্থীদের ব্যয়সীমার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের তিনজন মেয়র প্রার্থীই নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করেছেন। এর মধ্যে একজন সর্বোচ্চ ছয় কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয় করেন। অন্যদিকে, ঢাকা দক্ষিণের তিনজন মেয়র প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়সীমা অতিক্রম করলেও উত্তরের শুধু একজন প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা উত্তরের একজন মেয়র প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৬০ লাখ টাকা এবং ঢাকার দক্ষিণের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৫১ লাখ টাকা ব্যয় করেন। মেয়র প্রার্থীদের গড় ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রার্থীরা গড়ে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করেন, অপরদিকে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণের প্রার্থীরা গড়ে যথাক্রমে এক কোটি ৬০ লাখ ও দুই কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় করেন।

রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থীরা তিন সিটি করপোরেশনেই বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সমর্থিত প্রার্থী অপেক্ষা বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন। ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণে আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থীরা গড়ে তিন কোটি ৫৬ লাখ টাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ছয় কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয় করেন। অপরদিকে, বিএনপির প্রার্থীরা ঢাকায় গড়ে এক কোটি ৩৪ লাখ টাকা এবং চট্টগ্রামে এক কোটি ৪৪ লাখ টাকা ব্যয় করেন। জাতীয় পার্টির সমর্থিত প্রার্থীরা যথাক্রমে ঢাকায় গড়ে ৮৩ লাখ ও চট্টগ্রামে ৩৭ লাখ টাকা ব্যয় করেন।

মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের খাতওয়ারি হার : তিন সিটি করপোরেশনে খাতভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, পোস্টার ও লিফলেট বাবদ সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে ঢাকায় মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ২৮ দশমিক ৮ ও চট্টগ্রামে ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করে চট্টগ্রামে মেয়র প্রার্থীরা যাতায়াত ও পরিবহন (১০ দশমিক ৮ শতাংশ), জনসভা (১৭ দশমিক ৬ শতাংশ) ও মিছিল বা শোডাউনে (১৪ দশমিক ৭ শতাংশ) অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে ঢাকায় এই তিনটি খাতে অর্থ ব্যয়ের হার যথাক্রমে ৩ দশমিক ৭, ৩ দশমিক ৫ ও ৬ দশমিক ১ শতাংশ।

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয় : প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা গড়ে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন, যার পরিমাণ ২৩ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের কাউন্সিলর প্রার্থীরা ব্যয় করেছেন গড়ে ১৬ লাখ ৩৯ হাজার টাকা। অন্যদিকে, তিন সিটি করপোরেশনে আওয়ামী-সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা (চট্টগ্রামে ২৬ লাখ ৪১ হাজার এবং ঢাকায় ২৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা) বিএনপির সমর্থিত প্রার্থীদের (চট্টগ্রামে ১১ লাখ ৫৬ হাজার ও ঢাকায় নয় লাখ ১৪ হাজার টাকা) তুলনায় বেশি ব্যয় করেছেন। উল্লেখ্য, সিটি নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ছিল ছয় লাখ টাকা।

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের খাতওয়ারি হার : ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার, লিফলেট ও প্ল্যাকার্ড (৩০ দশমিক ৬ শতাংশ) বাবদ। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রামের প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে ক্যাম্প স্থাপন (২১ দশমিক শূন্য শতাংশ) ও জনসংযোগে (১৯ দশমিক ৭ শতাংশ)।

সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় : তিন সিটি করপোরেশনেই আওয়ামী-সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনী গড় ব্যয় বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থীদের চেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামে আওয়ামী ও বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৬ লাখ ৫৮ হাজার টাকা ও ১১ লাখ ৫২ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকায় আওয়ামী ও বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ও আট লাখ ২৬ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, সিটি নির্বাচনে সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকায় নয় লাখ পাঁচ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামে ১০ লাখ আট হাজার টাকা।

সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের খাতওয়ারি হার : ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার ও লিফলেট (২৬ দশমিক ৩ শতাংশ) এবং কর্মী ও এজেন্ট বাবদ (১৪ দশমিক ৪ শতাংশ)। অন্যদিকে, চট্টগ্রামের প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন ক্যাম্প স্থাপন (২১ দশমিক ২ শতাংশ) ও জনসংযোগে (১৯ দশমিক ৮ শতাংশ)।

প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ৫৮ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ক্যাম্পে খাবার, পানীয়, উপহার ও বকশিশ দিয়েছেন; নির্ধারিত সময়ের আগে ও পরে প্রচারণার কাজে মাইক ব্যবহার করেছেন ৪২ শতাংশ এবং একসাথে একাধিক মাইক ব্যবহার করেছেন ৪১ শতাংশ প্রার্থী; ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারকাজ চালিয়েছেন ৪২ শতাংশ প্রার্থী। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে জনসভা (৪০ শতাংশ), মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শোডাউন (২৬ শতাংশ), যানবাহন সহকারে মিছিল ও শোডাউন (২৩ শতাংশ), প্রার্থীদের পক্ষে প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁদা দেওয়া (২০ শতাংশ) ইত্যাদি ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

২.৪ তিন সিটি নির্বাচনে অংশীজনের ভূমিকা

নির্বাচন কমিশন : কোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সমর্থিত মেয়র প্রার্থীসহ তিনটি সিটি করপোরেশনের সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর কিছু প্রার্থীর নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সতর্ক নোটিশ ও আর্থিক জরিমানা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা থাকলেও কমিশন কঠোর শাস্তিমূলক (যেমন-প্রার্থিতা বাতিল) ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কমিশনের দুর্বল অবস্থানের কারণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। সেনা মোতায়েনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে পক্ষপাতের অভিযোগসহ বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি, কোথাও কোথাও নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ, ভোটের দিন কেন্দ্র দখল, কারচুপি, অবাধে ব্যালট পেপারে সিল মারা ইত্যাদি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কর্মীদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের হামলার শিকার হওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার মতো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়। সর্বোপরি নির্বাচনী আইন ভঙ্গ করে রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন ঘোষণা করলেও সে ক্ষেত্রে কমিশন কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

রাজনৈতিক দল : রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি নির্বাচনী কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চিত্র লক্ষ করা গেছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে প্রার্থীদের দলীয় সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অনেক প্রার্থী যারা নিজ দলের সদস্য তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলটির সংসদ সদস্যসহ নেতা-কর্মী (স্থানীয় ও বহিরাগত) দ্বারা ব্যাপকভাবে ভোটকেন্দ্রগুলোর একাংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রকাশ্যে সিল মারাসহ বিভিন্নভাবে ভোট জালিয়াতি এবং এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল-সমর্থিত প্রার্থী ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে দেয়নি। এ ছাড়া প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় ও অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। যেমন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মী না দেওয়া, মেয়র প্রার্থীদের মতামত না নিয়ে ভোটের দিন নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা, যা নির্বাচন-প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পদক্ষেপ না নেওয়া এবং আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থীদের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালনসহ কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

নাগরিক সমাজ ও সংগঠন : তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে যেহেতু সব মহলের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল, সেহেতু নাগরিক সমাজও এই নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। তারা প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহার, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ইত্যাদির ওপর বিশ্লেষণমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করেছে, সঠিক প্রার্থী নির্বাচন, প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টক শো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, গোলটেবিল আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে নাগরিক সমাজের দুটি অংশ দুটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায়, যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে।

ভোটার : নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় ভোটারদের কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনেকে ভোট দিতে পারলেও জাল ভোট দেওয়া ও বাধার মুখে কেউ কেউ ভোট দিতে পারেননি। তা ছাড়া নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রার্থীদের আয়োজনে ভোটকেন্দ্রে আসা এবং ভোটের আগের দিন রাতে বিভিন্ন বস্তি ও কলোনিতে প্রার্থী কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থ নিম্ন আয়ের লোকজন দ্বারা গ্রহণ লক্ষণীয়।

সংবাদমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) : তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব ভূমিকার মধ্যে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহারের তথ্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা, নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য অংশীজনের কর্মকাণ্ড প্রচার ও প্রকাশ করেছে। বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টক শো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে এ ধরনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে প্রধান দুটি দল-সমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের প্রচারণা-সংক্রান্ত সংবাদ অন্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেলেও পরে অন্য প্রার্থীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনের দিন কেন্দ্রভিত্তিক অনিয়ম তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন কার্যত একটি দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন ও সমর্থন দান, প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা, সরকারের পক্ষ থেকে সরকার-সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতার ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি ঘটনা এক নির্বাচনেরই বহিঃপ্রকাশ। এ ছাড়া ভোটকেন্দ্রে বিরোধী দল-সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্ট ও দলীয় সমর্থকদের ব্যাপক অনুপস্থিতি এবং দলীয় নির্দেশনায় নির্বাচনের দিন মধ্যপথে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘটনা নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যকে বিতর্কিত করে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা দেখাতে না পারা, নির্বাচনী আইন সব প্রার্থীর জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না হওয়া, আচরণবিধি লঙ্ঘনে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতের কারণে

নির্বাচনে সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থীদের পক্ষ থেকেও আচরণবিধি মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রার্থী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘন লক্ষণীয়। সার্বিক বিবেচনায় তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না।

সুপারিশমালা

১. সিটি করপোরেশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার ও হালনাগাদ করতে হবে–
   - সব প্রার্থীর নির্বাচনী সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা খাত অনুযায়ী (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ) নির্দিষ্ট করতে হবে;
   - নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের বিধান রাখতে হবে;
   - নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
   - সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের ব্যয়সীমা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে;
   - প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান রাখতে হবে;
   - সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকে নির্বাচনী বিধির আওতায় আনতে হবে।

২. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. ভোট জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে।

৪. নির্বাচনী কর্মকর্তা (প্রিসাইডিং, রিটার্নিং ও পোলিং কর্মকর্তা) এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের সহজ প্রবেশাধিকারসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক প্রভাব ও বাইরের চাপ উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনের মতো যোগ্য ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দিতে হবে।

৭. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে তার সাংবিধানিক ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : উত্তরণের উপায়*

দিপু রায়

১. ভূমিকা

একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অত্যন্ত জরুরি। আর সরকারি দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না, তা জনসমক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি সম্পদের ব্যবহার এবং সরকারি অর্থ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বণ্টনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী একটি পূর্ণ চিত্র প্রদান করে। হিসাবরক্ষণ সরকারি ব্যয়ের দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রহরী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে 'হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (সিজিএ) অফিস'। যেকোনো সরকারি বিল বা অর্থছাড় অনুমোদন করার আগে তাতে কোনো প্রশাসনিক, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে কি না, তা যাচাই করা এই অফিসের দায়িত্ব।

গত কয়েক বছরে সিজিএ অফিসে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির অটোমেশনসহ বিভিন্ন রকম ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও এর কিছু সমস্যা এখনো বিদ্যমান। এর মধ্যে জনবলের অভাব, তাদের কর্মদক্ষতার অভাব, আইনগত সীমাবদ্ধতা, কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, স্থাপনা ও লজিস্টিক সুবিধার অভাব উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের বিল পাস করাতে ঘুষ, হয়রানি, বিল হারিয়ে ফেলা, হিসাবের প্রতিবেদন তৈরিতে বিলম্ব ইত্যাদি অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্নীতি রোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ভিত্তিতে সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় টিআইবি ২০০৩ সালে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয়ের ওপরে একটি তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে সিজিএ কার্যালয়ের সমস্যাগুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিজিএ কার্যালয়ের সমস্যা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সিজিএ কার্যালয়ে সুশাসনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) এই কার্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত করা, (২) এই কার্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রক্রিয়া, কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করা এবং (৩) এ কার্যালয় যেন স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

---

* ২০১২ সালের ১২ আগস্ট ঢাকায় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি প্রধানত একটি গুণবাচক তথ্যভিত্তিক গবেষণা। এই গবেষণায় সিজিএর (সিভিল) আইনি, কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (জিডি), পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা-সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিজি অফিস, ডিপার্টমেন্ট ও বোর্ড, সরকারি কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ৩০টি সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সিজিএ, সিএজি অফিসের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় ১৫০ জন মুখ্য তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি প্রকাশনা, সংবিধান, সিএজি ও সিজিএ প্রকাশনা, ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়।

২. প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও আইনগত কাঠামো

১৯৪৭ সালে প্রাথমিকভাবে গঠিত হয়ে স্বাধীনতার পরে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল–এজি (সিভিল), বাংলাদেশ নামে কাজ শুরু করে। সংবিধান অনুসারে সিজিএ সিএজির অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সিজিএ অর্থ মন্ত্রণালয়েরও অধীন। সিজিএর কার্যাবলি 'দি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪', 'দি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫', 'কোড অব অ্যাকাউন্টস', 'অডিট কোড', 'ট্রেজারি রুলস', 'জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর)', 'বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস', 'সিজিএ ম্যানুয়াল'সহ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সারা দেশে সিজিএর বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস রয়েছে। এ ছাড়া সিজিএর নিয়ন্ত্রণে ঢাকায় মন্ত্রণালয় অনুসারে একটি করে প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস ও হিসাবরক্ষণের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিজিএ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৫টি বিভাগ রয়েছে। সারা দেশে সিজিএর মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮৮২ জন। সিজিএ উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করে সিএজির কাছে পাঠায়; সিএজি এই প্রতিবেদন অনুমোদনসহ সংসদে পেশ করে। নিরীক্ষাধীন অফিসগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিল, বেতন নির্ধারণ ও ছুটির হিসাব সংরক্ষণসহ সরকারের সব ধরনের ব্যয়ের বিল এই অফিসের মাধ্যমে পাস করা হয়।

৩. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

সিজিএ যেসব আইন এবং বিধিবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেসব আইনকানুন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা অনেক সময় প্রয়োজনীয় সেবা দিতে ব্যর্থ হয়।

৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

ব্রিটিশ আমলের ট্রেজারি কোড, অ্যাকাউন্টস কোডের বিভিন্ন ভলিউম ও বাংলাদেশ সার্ভিস রুল অনুযায়ী সিএজি ও সিজিএ অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত আইনের যুগোপযোগী সংস্কার না হওয়ার ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলো মানতে গিয়ে দুর্নীতির সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তার থেকে বেশি বা কম পান কিংবা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হন। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পাসকৃত আইনসংবলিত আকারে প্রকাশিত না হওয়া এবং আইনের ব্যাখ্যা সহজবোধ্য না হওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। তাই সরকারি কর্মকর্তারা তাদের জানা আইন অনুযায়ী কোনো কিছু দাবি করলে সিজিএ কর্মকর্তারা তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কোনো কোনো সিজিএ কর্মকর্তা আবার এই নানাবিধ আইনের মধ্যে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী একেক সময় একেক রকম আইন অনুসরণ করেন। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হন এবং তাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত হন। আবার সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মনীতি রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ম, নাকি সরকারের সাধারণ নিয়ম কার্যকর হবে- অর্থ মন্ত্রণালয় তা হালনাগাদ না করায় অডিট টিম ওই সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম না মেনে আপত্তি উত্থাপন করে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে অডিট আপত্তি মিটছে না এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৩.২.১ *প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব*

প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব সিজিএ অফিসের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমানে এ অফিসে ৩৭ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে ৪০ দশমিক ২৮ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৬ শতাংশ। প্রতিবছরই সরকারি বাজেটের পরিমাণ ও বিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই বিল বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সিজিএ অফিসের জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরে কাজের চাপ ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। প্রতিটি কেস, ফাইল, বিল আলাদাভাবে মূল্যায়ন করার মতো প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল সিজিএর নেই। তাই এর কার্যক্রম দক্ষভাবে ও সময়মতো পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। জনবলের অভাবে সরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা সিজিএ অফিসের কাজ করেন। তারা রেজিস্টার খুঁজে সেখানে এন্ট্রি দেন, এমনকি কম্পিউটারেও এন্ট্রি দেন। ফলে অনেক সময় সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন হয় না। ভুল বা মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নিতে সক্ষম হন। আবার ভুল বা মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করার কারণে হিসাবে গরমিল তৈরি হয়, যা যাচাই করে দেখার মতো যথেষ্ট জনবল এখানে নেই।

৩.২.২ *হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব*

সিজিএ অফিস যে হিসাব বিবরণী তৈরি করে তাতে প্রায়ই গরমিল দেখা দেয়। আগের তুলনায় এই গরমিল কম হলেও এখনো কোড নম্বরের অমিল হওয়ার জন্য হিসাবে গরমিল হয়। হিসাবরক্ষণ

করা সিজিএর প্রধান কাজ হলেও তারা বিল পাস করার প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসে মিলিয়ে দেখার নিয়ম থাকলেও হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোর অবহেলার কারণে তা করা হয় না। ফলে চূড়ান্ত হিসাব করার সময়ে ভুলগুলো ধরা পড়ে। যেকোনো হিসাবের, বিশেষ করে উন্নয়ন বাজেটের টাকার হিসাব মেলানো না গেলেই তা অমীমাংসিত টাকা হিসেবে দেখানো হয়। এই অমীমাংসিত টাকার পরিমাণ কম (৩০-৪০ কোটি) হলে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু এই টাকার পরিমাণ ১০০ কোটি বা তার বেশি হলে, অর্থ মন্ত্রণালয় সিজিএকে অবশ্যই ডেবিট-ক্রেডিট মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বলে। সে ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়ে হিসাব মিলিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। ফলে এই প্রতিবেদনে সরকারের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র না পাওয়ায় পরবর্তী বছরের বাজেট প্রণয়নে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না।

৩.২.৩ *সময়মতো হিসাবের প্রতিবেদন সম্পন্ন না করা*

হিসাবের প্রতিবেদন সময়মতো তৈরি করার ওপরে নির্ভর করে সরকারের পরবর্তী বছরের সফল বাজেট প্রণয়ন। সিজিএ অফিস থেকে প্রতি অর্থবছরের উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিএজি বরাবর পাঠানোর নিয়ম রয়েছে। এরপর সিএজির পক্ষ থেকে সিভিল অডিট বিভাগ কর্তৃক তা পরীক্ষা করা, ভুল সংশোধন করা ও সিএজির মন্তব্য নেওয়া পর্যন্ত সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী বছরের ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া রয়েছে। কিন্তু হিসাব প্রতিবেদনের গুণগত মান বজায় রাখা, সিএজির সিভিল অডিট বিভাগের কোনো তথ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হওয়া, প্রতিবেদন প্রকাশের নির্ধারিত সময়ের পর হিসাবের ভুল নিরূপণ ও প্রতি মাসে হিসাব করে ভুল চিহ্নিত না করা, বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর হিসাব সময়মতো না আসা এবং বিজি প্রেসের শিডিউল না পাওয়ার কারণে এই সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে এই হিসাবের বিবরণ বাজেট তৈরিতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩.২.৪ *নিয়োগ, পদোন্নতি ও অর্গানোগ্রামে সমস্যা*

২০০২ সালে সিএজি থেকে সিজিএ পৃথক হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নিয়োগ, পদোন্নতি, পদাধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সিজিএর নিজস্ব কোনো বিধিমালা তৈরি হয়নি। সিজিএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদায়ন সিএজির মাধ্যমেই হয়; সিজিএ কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। নিজস্ব নিয়োগ বিধি না থাকায় নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে কোনো শর্ত দিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সিজিএ বাণিজ্য বা কম্পিউটারবিজ্ঞান থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর জনবল নিয়োগ করতে পারছে না। ফলে সময়মতো ও নির্ভুলভাবে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। অন্যদিকে এ অফিসের নিয়োগ অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য সিজিএকে সিএজির ওপরও নির্ভর করতে হয়। এদের পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিও সিএজিই করে থাকে। ১৯৮৩ সালের তুলনায় বর্তমানে সারা দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সিজিএর জনবল এখনো ১৯৮৩ সালে 'এনাম কমিটি'র তৈরি করা অর্গানোগ্রাম অনুসারেই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে সীমিত রয়েছে । ২০০৪-০৫ সালে সিজিএর একটি নতুন অর্গানোগ্রাম প্রস্তাব করা হলেও তা এখন পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। বর্তমানে বেশ কিছু পদে

নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলেও তা ১৯৮৩ সালের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী করা হচ্ছে। আবার নিজস্ব নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় সিভিল অডিটসহ অন্যান্য বিভাগ যেমন- পিটিঅ্যান্ডটি, পূর্তসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন এলেও সিভিল অডিটের নিয়মেই (৭০ শতাংশ নিয়োগ ও ৩০ শতাংশ পদোন্নতি) পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে নিয়মিত পদোন্নতি না দেওয়ায় অনেক কর্মচারী যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পদোন্নতি পাচ্ছেন না। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে সিজিএর কার্যক্রমের ওপরে।

৩.২.৫ *সিএজি, সিজিএ ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়ে সমস্যা*

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের হিসাবরক্ষণের ভার সিএজির ওপর ন্যস্ত। ফলে সিজিএর অর্গানোগ্রাম, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ক্ষমতার পরিধি ইত্যাদি বিষয় সুনির্দিষ্ট নয়। সংবিধানে সিজিএর দায়দায়িত্ব, কার্যকাল, প্রতিবেদন উপস্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলা হয়নি। সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদে সিএজির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের হিসাবরক্ষণের আকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। অথচ সংবিধান পরিবর্তন না করেই অর্থ মন্ত্রণালয় তার আদেশ বলে ২০০২ সালে সিজিএকে সিএজি থেকে আলাদা করে। ফলে বিভাজন হলেও সিজিএকে কোনো কাজ করতে হলে তা সিএজি থেকে আগে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। আবার সিজিএ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসারেও এর সব কার্যক্রম পরিচালনা করে। এভাবে সিজিএর কার্যক্রম দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। সিজিএ সিএজির মতো স্বাধীনভাবে কাজ করবে, নাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নির্দিষ্ট করা নেই।

৩.২.৬ *জবাবদিহির সমস্যা*

অডিট থেকে অ্যাকাউন্টসকে আলাদা করার ফলে সিজিএর কার্যক্রম তদারকির জন্য সিএজি দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। সিজিএর কার্যক্রম সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ও অবগত নয়। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সিজিএর কার্যক্রম মনিটরিং করার মতো কোনো সেল বা দক্ষ জনবল অর্থ মন্ত্রণালয়ে নেই। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সাত মাস যাবৎ সিজিএর পদ খালি। সিজিএর কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব কোনো নৈতিক আচরণবিধি না থাকায় তারা সিএজির আচরণবিধি মেনে চলে। এই আচরণবিধি পালন করার জন্য কোনো মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কর্মকর্তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে গেলে কর্মচারী সমিতির প্রভাবে তা করা সম্ভব হয় না। পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষতা ও শৃঙ্খলা শাখা দুটি দক্ষ কর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সদিচ্ছার অভাবে কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। উচ্চ থেকে নিম্নপদস্থ সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এ অফিসের দুর্নীতি ও হয়রানি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অন্যদিকে শাস্তির প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে অপরাধী পার পেয়ে যাওয়ায় কোনো কর্মকর্তাই কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চায় না। এখানে হয়রানি করা ও ঘুষ আদায়ের জন্য দিনের পর দিন বিল ধরে রাখলেও তা মনিটর করার কেউ নেই এবং এর জন্য কোনোরকম শাস্তি পেতে হয় না।

৩.২.৭ *সিজিএর কার্যক্রমের ওপর মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেডিং সমস্যা*

সিজিএ কার্যালয় নিজস্ব বিধিবিধান অনুযায়ী কাজ করতে না পারার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ প্রতিনিয়ত সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ। তারা আর্থিক হিসাবের নিয়মকানুন মানতে চান না। অধিকাংশ সিএও সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের তুলনায় জুনিয়র। সিএওর এসিআর সিজিএ লিখলেও প্রতিস্বাক্ষর করেন সংশ্লিষ্ট সচিব। সচিবদের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসারের ক্ষমতা থাকায় তারা সিএওর আপত্তিকে উপেক্ষা করতে পারেন। সুতরাং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সিএওর কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব পড়ে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিসের বিলে আপত্তি দেওয়ার প্রয়োজন হলেও মন্ত্রী বা সচিবের আদেশে ভুয়া বিল পাস করিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এসব অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও মন্ত্রণালয় থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। জেলা-উপজেলার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদেরও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) বিলের ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। আবার রাজনীতিকরণের কারণে সিএওদের পদায়নে মন্ত্রী-সাংসদদের প্রভাব থাকায় সিএওরাও অনেক সময় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিল পাস করে দেন। অন্যদিকে সিজিএ কার্যালয়ের প্রধান কন্ট্রোলার জেনারেল অব অ্যাকাউন্টস বা সিজিএ একজন গ্রেড-২ মর্যাদার কর্মকর্তা। সিজিএর পরেই অতিরিক্ত সিজিএ যুগ্ম সচিব (গ্রেড-৩) মর্যাদার না হয়ে গ্রেড-৪ মর্যাদার কর্মকর্তা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরা দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেলেও সিজিএতে তা করা হয় না। যেখানে নার্স, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, সমবায় অফিসার, সাব রেজিস্ট্রার দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, সেখানে সিজিএর অডিটর তৃতীয় শ্রেণির। এখানে সিলেকশন গ্রেডের সুযোগও বন্ধ রয়েছে।

৩.২.৮ *অফিস স্থাপনা ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব*

অবকাঠামোগত সমস্যা সিজিএ অফিসের অন্যতম সমস্যা। কোনো কোনো প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে কর্মচারীদের বসার জায়গা অপ্রতুল। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ অফিসের নিজস্ব কোনো কার্যালয় নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসকের অফিসেই হিসাবরক্ষণ অফিসগুলো অবস্থিত। দু-তিনটি কক্ষ নিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসের অবস্থান, যেগুলোতে জমে আছে রেজিস্টার ও কাগজপত্রের বড় বড় স্তূপ। এই স্তূপ থেকে কোনো কাগজ বের করে কাজ করাও কষ্টকর। রেজিস্টারগুলো ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আলমিরাসহ অন্যান্য জিনিসের অভাবে কাগজপত্র, রেজিস্টার, ফাইলের ব্যবস্থাপনা করা যাচ্ছে না। অপর্যাপ্ত কম্পিউটার ও লোডশেডিংয়ের কারণে সময়মতো সব কাজ করতে কর্মীরা সক্ষম হন না।

৩.২.৯ *প্রশিক্ষণে সমস্যা*

সিজিএ অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের নিজস্ব কোনো ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সেন্টার নেই। আগে সিএজির নিয়ন্ত্রণে সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, এখনো সেভাবেই দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। চাকরি পাওয়ার পর ফিমা থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কোনো প্রশিক্ষণই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। ফিমা থেকে অন্য যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেগুলো সিজিএর প্রয়োজন অনুসারে হয় না; বরং ফিমা প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করে সিজিএকে জানায়। ফলে কী বিষয়ের ওপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা অনেক সময় আগে জানানো হয় না। তা ছাড়া এখনো পুরোনো ধাঁচের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তা তথ্যনির্ভর হওয়ার কারণে বর্তমান কাজের সাথে সংগতিহীন বলে কাজে লাগানো যায় না।

৩.২.১০ *নাগরিক সনদে সীমাবদ্ধতা*

সিজিএর নাগরিক সনদ সিজিএর ওয়েবসাইটে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া রয়েছে। এটি ইংরেজি ভাষায়। ফলে অনেক কর্মচারীর কাছেই বোধগম্য নয়। এর কোনো প্রচার না হওয়ায় স্টেকহোল্ডাররা এটি সম্পর্কে অবগত নন। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সিজিএ অফিসে কোনোরকম চাপ সৃষ্টি করতে পারেন না। সনদ প্রণয়নের সময় সিজিএ অফিসের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ না থাকায় সনদে স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রকাশ পায়নি। এটিতে কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকায় কবে হালনাগাদ করা হবে, তার কোনো নির্দেশনা নেই।

৪. সিজিএ অফিসের অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কি না, ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট আছে কি না, সংশ্লিষ্ট নিয়ম মানা হচ্ছে কি না এবং মঞ্জুরি আছে কি না ইত্যাদি বিষয় নিরীক্ষা করে এ অফিস বিল অনুমোদন করে থাকে। যেসব বিলে কোনো সমস্যা থাকে না, সেগুলোকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পাস করে চেক ডেলিভারি দেওয়া, আর যেসব বিল নিয়মমাফিক হয়নি, সেগুলোর ওপরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপত্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়াই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশ অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করে। নিচে সেবাগ্রহীতারা সিজিএ অফিস থেকে কী ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হন, সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

৪.১ নিয়োগ, পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সিজিএ অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং স্বজনপ্রীতি করা হয়। কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সিজিএ ও কর্মচারী সমিতির নেতাদের মধ্যে দর-কষাকষি চলে। কতজন দলীয় লোক নিয়োগ দিতে হবে তা কর্মচারী সমিতি নির্ধারণ করে দেয়। সিজিএ তাতে রাজি না হলে কখনোই এই নিয়োগ সম্ভব নয়। আর যারা কর্মচারী সমিতির সুপারিশে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়, তাদের প্রত্যেককেই ঘুষ দিতে হয়। এ ধরনের নিয়োগের জন্য মন্ত্রীদের মাধ্যমে তদবিরও করানো হয়। ঘুষ দিয়েও এ তদবির করা হয়। এ ক্ষেত্রে এক লাখ টাকার ওপরেও ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, এলজিইডি, কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ অন্য যেসব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক লেনদেন, বাজেট, অফিস, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রকল্পের সংখ্যা বেশি, সেসব মন্ত্রণালয়ের সিএও অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পদায়ন পাওয়ার জন্য মন্ত্রী-সাংসদদের মাধ্যমে সুপারিশ করানো এবং ঘুষ দিয়ে থাকেন। ফলে অবৈধ পন্থায় পদায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ব্যাপক প্রবণতা থাকে। বদলির ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ এতই বেশি যার প্রমাণ অনেক হিসাবরক্ষণ অফিসে পদ না থাকার পরও অতিরিক্ত কর্মী থাকা। আবার অনেক জায়গায় পদ থাকলেও কর্মী নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম শ্রেণির ৩৮টি পদের বিপরীতে কর্মরত ৪১ জন। রাজশাহীতে ৩২৩টি পদ থাকলেও সেখানে অতিরিক্ত কর্মরত রয়েছে ৫১ জন। আবার সিলেটে ৯৯ জনের জায়গায় কর্মরত রয়েছেন ৭৩ জন।

৪.২ নতুন বেতনস্কেল সংযোজনে (Fixation) দুর্নীতি

নতুন বেতনস্কেলে বেতন পেতে হলে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে তা সংযোজন করা প্রয়োজন। নতুন বেতনস্কেল ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই সিজিএ অফিসে তা সংযোজন হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৯ সালের ঘোষিত বেতনস্কেল পেতে যেসব অফিস দ্রুত ঘুষ দিতে পেরেছে, ওই সব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনস্কেল ঘোষণার পরবর্তী মাসেই সন্নিবেশ হয়ে গেছে। আর যাদের ঘুষ দিতে দেরি হয়েছে তাদের নতুন বেতনস্কেল সংযোজন হতেও দেরি হয়েছে। যারা ঘুষের বিনিময়ে তাদের বেতনস্কেল সংযোজন করেছেন, তাদের জনপ্রতি সাধারণত সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে। কোনো কোনো সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ঘুষ দিতে রাজি না হওয়ায় ২০১০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও অনেকের নতুন বেতনস্কেল সংযোজন হয়নি। যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগে জটিলতা, স্বজনপ্রীতি কিংবা অনিয়ম রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নতুন বেতনস্কেল সংযোজন করতে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়। এ ধরনের কর্মচারীদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয় এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিজিএ কর্মী নিজেই সব কাগজপত্র তৈরি করে জমা দেন।

৪.৩ প্রথম বেতন ও বোনাস পেতে দুর্নীতি

চাকরি পাওয়ার পরে প্রথম বেতন তুলতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানির শিকার হওয়া নিয়মিত ঘটনা। এ সময় বিভিন্ন কাগজপত্র চেয়ে হয়রানি করা হয়, কিন্তু ঘুষ দিলে খুব সহজেই কাজ হয়ে যায়। প্রথম বেতন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের তুলনায় কর্মচারীদের, বিশেষ করে প্রকল্পের কর্মচারীদের হয়রানি বেশি করা হয়। আবার বোনাস উত্তোলনের সময় অনেকগুলো টাকা একসাথে দেওয়া হয় বলে এ সময়ে সিজিএ কর্মীরা কিছু উপরি আয়ের চেষ্টা করেন।

৪.৪ প্রকল্প ও ঠিকাদারের বিলে দুর্নীতি

সিজিএ অফিসে দুর্নীতির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিল। প্রকল্পের বিল অনুমোদন করার ক্ষেত্রে সিজিএ অফিসে কিছু নিয়মকানুন অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে থাকে, যেমন চুক্তিতে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণের অতিরিক্ত বিল পেশ করা হয়েছে কি না, বিলটি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত কি না, বছরের বাজেটে খাত অনুযায়ী বরাদ্দ আছে কি না, সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরি প্রদানকারী অফিসের অনুমোদন আছে কি না, ক্যাশে টাকা আছে কি না, ডিডিওর স্বাক্ষর রয়েছে কি না, সরকারের ভ্যাট ও ট্যাক্স কাটা হয়েছে কি না ইত্যাদি। এসব কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা ঘুষের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করে নিতে সমর্থ হন। আবার দেখা যায়, সব নিয়মকানুন মেনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও ঠিকাদারদের ঘুষ দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঘুষ সাধারণত শতকরা হারে দিতে হয়। বিলের পরিমাণ এক লাখ টাকার নিচে হলে ঘুষ দিতে হয় ৫ থেকে ১০ শতাংশ। বিল এক লাখ থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে হলে ১ থেকে ১ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ নেওয়া হয়। আর বিল পাঁচ লাখের বেশি এবং ২০ লাখের মধ্যে হলে শূন্য দশমিক ৫০ থেকে ১ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়। কোটি টাকা বা এর বেশি বিল হলে শূন্য দশমিক ২০ থেকে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষের হার মে-জুন মাসে আরও বেশি হয়ে যায় এবং ১০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছায়। আবার ঈদ বা পূজার সময়ও বেশি হারে ঘুষ দিতে হয়।

৪.৫ ভ্রমণ ও দৈনিক (টিএ-ডিএ) ভাতা বিলে দুর্নীতি

ভ্রমণভাতা বিলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কোনো অফিস নেই যেখানে টিএ-ডিএ বিল পাস করাতে দুর্নীতির শিকার হতে হয় না। বিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিল দিতে দেরি হবে, অন্য কাজে ব্যস্ত, বিলের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়নি, বিলে কাটাকাটি হয়েছে ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিল আটকে রাখাসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। আবার ঘুষ দিলে খুব সহজেই সে বিল পাস হয়ে যায়। এ খাতে ঘুষের পরিমাণ সাধারণত ১ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ওঠানামা করে। আবার কখনো থোক ৫০, ১০০, ৫০০ ও এক হাজার টাকা বা এর থেকেও বেশি ঘুষ দিতে হয়। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই প্রাপ্যের বেশি পরিমাণ বিল করে ঘুষের মাধ্যমে পাস করিয়ে নেন।

৪.৬ আনুষঙ্গিক (কন্টিনজেন্সি) বিলে দুর্নীতি

আনুষঙ্গিক খাতে বিল বাড়িয়ে লেখার সুযোগ অনেক বেশি থাকায় এই বিলে সর্বোচ্চ ঘুষ নেওয়া হয়। যেসব অফিসে আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ বেশি, সেখানে ঘুষ লেনদেনও বেশি। সাধারণত আনুষঙ্গিক বিল পাস করাতে বিলের ১ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। তবে কখনো কখনো বিলের অঙ্ক বড় হলে বিলের ৩ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত, বিলের পরিমাণ এক লাখ টাকার মধ্যে হলে ১ শতাংশ এবং এর অধিক হলে বিলের শূন্য দশমিক ২০ থেকে শূন্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়।

৪.৭ পেনশন পেতে দুর্নীতি

আগের তুলনায় হয়রানি কিছুটা কম হলেও ঘুষ না দিয়ে পেনশন উত্তোলন করা সম্ভব নয়। সরকারি কর্মচারীদের সারা জীবনের বেতন নির্ধারণ ও বেতন-ভাতা পরিশোধ হিসাবরক্ষণ অফিস করলেও দেখা যায় চাকরিজীবনের শেষে পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানের প্রাক্কালে আবার বেতন নির্ধারণী যাচাই করা হয় এবং অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে যা ফেরতযোগ্য বলে হয়রানি করা হয়। আবার ঘুষ দিলে পেনশনের ফেরতযোগ্য বলে কিছু থাকে না। উত্তোলনের আগেই যদি দর-কষাকষি করে একটি সমঝোতায় আসা যায় তাহলে পেনশন পেতে কোনো হয়রানির সম্মুখীন হতে হয় না। প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র সিজিএ অফিসের কর্মচারীরাই সরবরাহ করে কম সময়ের মধ্যে পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। আবার সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েও ঘুষ নিয়ে সমঝোতায় না এলে বিভিন্ন নিয়মকানুন দেখিয়ে বিল ফেলে রাখা, আপত্তি তুলে ফিরিয়ে দেওয়া, সব আপত্তি একসাথে না দিয়ে বারবার আপত্তি দেওয়া, সার্ভিস রেকর্ডে সমস্যা রয়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয়রানি করা হয়। বিলের ওপরে বিভিন্ন আপত্তি দিয়ে আবার নিজেরাই ঘুষের বিনিময়ে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। সাধারণত পেনশন বিলের ১ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ হিসেবে দিতে হয়, আবার থোক হিসেবে দিলে পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্তও ঘুষ দিতে হয়। তবে যাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকে তাদের ঘুষের পরিমাণ সব সময় বেশি হয়ে থাকে।

৪.৮ ঋণ ও জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ পাঠানো ও এই ফান্ডের টাকা অগ্রিম উত্তোলনে ঘুষ

জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বরাবর পৌঁছানোর নিয়ম থাকলেও কিছু কিছু প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস জিপিএফ

অ্যাকাউন্ট স্লিপ কখনোই নিজ থেকে না পাঠানোর কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদের এসে স্লিপ নিতে হয়। আর কাউকে নিজ থেকে জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ নিতে হলেই এর জন্য বকশিশ বা ঘুষ দিতে হয়। সাধারণত জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ নেওয়ার জন্য ১০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। অন্যদিকে জিপিএফ ব্যালান্স স্থানান্তর ও জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলন বা চূড়ান্ত পরিশোধ বিল জমা দেওয়ার তারিখ থেকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার কথা থাকলেও এই টাকা উত্তোলনে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়।

৪.৯ অনিয়ম ও দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

ওপরে উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও সরকারি কর্মকর্তারা-কর্মচারীরা বিভিন্ন বিল বা অন্যান্য কাজ করানোর জন্য সিজিএ অফিসে গিয়ে থাকেন এবং হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হন। সিজিএ অফিসে সেবা নিতে গিয়ে ২৩টি খাতে ঘুষ দিতে হয় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে (সারণি ১)।

সারণি ১ : সিজিএ অফিসে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

ক্রম	সেবা খাত	ঘুষের পরিমাণ
১	নতুন বেতনস্কেল সংযোজন	২০-২০০০ টাকা
২	প্রথম বেতন উত্তোলন	১০০-২০০ টাকা
৩	বোনাস উত্তোলন	১০০-২০০ টাকা
৪	ঠিকাদারের বিল উত্তোলন	বিলের শূন্য দশমিক ২০- ১০ শতাংশ
৫	গাড়ির তেল বা গ্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণে বিল উত্তোলন	বিলের ১ থেকে ১০ শতাংশ
৬	ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিল উত্তোলন	বিলের ২ শতাংশ
৭	কুরিয়ার বিল উত্তোলন	বিলের ১ থেকে ৫ শতাংশ
৮	শ্রমিক মজুরির বিল উত্তোলন	বিলের ১ শতাংশ
৯	টিএ-ডিএ বিল উত্তোলন	বিলের ১ থেকে ১০ শতাংশ বা ৫০-১০০০ টাকা
১০	কন্টিনজেন্সি বিল উত্তোলন	বিলের শূন্য দশমিক ২০ থেকে ৭ শতাংশ
১১	পেনশন উত্তোলন	বিলের ১ থেকে ১০ শতাংশ
১২	টাইম স্কেল সংযোজন করানো	৩০০-১০০০ টাকা
১৩	কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ	৫০-১০০ টাকা
১৪	বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট উত্তোলন	৫০০-১০০০ টাকা
১৫	এলপিসি উত্তোলন	১০০-৫০০ টাকা
১৬	জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ	২০-১০০ টাকা
১৭	জিপিএফের টাকা অগ্রিম উত্তোলন	৫০০-৫০০০ টাকা
১৮	কনসালট্যান্টের বিল উত্তোলন	বিলের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ
১৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা উত্তোলন	৫০-২০০ টাকা
২০	পোশাক ভাতা উত্তোলন	বিলের ১০ শতাংশ
২১	কম্পিউটারে বিল এন্ট্রি করানো	১০-২০ টাকা
২২	চেক ডেলিভারি করানো	২০-৫০ টাকা
২৩	ভুল সংশোধন	৫০-৫০০ টাকা

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় সিজিএ অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ নেওয়ার কথা স্বীকার করেন এবং এর সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তাদের মতে, যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিল পাস করাতে ঘুষ নেওয়া হয়, সেসব সেবাগ্রহীতা অফিস বা ব্যক্তির বিলে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা থাকে। এ কারণে তারা ঘুষ দিয়ে বড় বড় দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করেন।

৫. সুপারিশ

সিজিএ অফিসের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সুশাসন-সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হলো।

৫.১ নীতিগত উদ্যোগ

১. সংবিধান সংশোধন করে সিজিএকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে।

২. সিজিএ অফিসকে দ্বৈত ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করতে হবে, অর্থাৎ সিজিএ সিএজি না অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৩. সিজিএসহ সব পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সিজিএর পদটি গ্রেড-১ করার মাধ্যমে নিচের অ্যাডিশনাল সিজিএ, সিএও, এএও, সুপারিনটেনডেন্ট ও অডিটরদের গ্রেড বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে যোগ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি ‘নৈতিকতা কমিটি’ গঠন করতে হবে। দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সব ধরনের নৈতিক আচরণবিধি লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ কমিটির কাছে তাদের অভিযোগ দাখিল করবেন এবং কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

৫.২ সেবাগ্রহীতাদের সংক্ষুব্ধি (grievance) প্রশমন-সংক্রান্ত

৫. দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য সিজিএতে একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে। যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের সমস্যা নিয়ে এই ন্যায়পালের কাছে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন এবং ন্যায়পাল তার সুষ্ঠু সমাধান দেবে।

৫.৩ অবকাঠামো ও লজিস্টিক-সংক্রান্ত

৭. সিজিএ অফিসের সব ধরনের কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) ব্যবস্থাপনার আওতায় নিতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোকেও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি সরকারি অফিসের সাথে সিজিএ অফিসের হিসাবের লিঙ্ক থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও বাজেট নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সিজিএ অফিসের কাজে যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. জেলা ও উপজেলা পর্যায়সহ ঢাকা অফিসেও কাগজপত্র রাখার জন্য রুম, শেলফ, সরকারি ফরম, লেজার, অ্যাকাউন্ট স্লিপ ইত্যাদি অন্যান্য লজিস্টিক বাড়াতে হবে।

৫.৪ অর্গানোগ্রাম ও জনবল-সংক্রান্ত

১০. বর্তমানে প্রয়োজনীয় জনবলের ভিত্তিতে সিজিএ অফিসের অর্গানোগ্রাম নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে।

১১. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। সব শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে।

১২. সিজিএ অফিসে কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তার দ্রুত সমাধান করে যোগ্য কর্মচারীদের পদোন্নতি দিতে হবে। তিন বছর পরপর পদোন্নতির যে বিধান রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

১৩. এএওদের (নন ক্যাডার) পদোন্নতির সংখ্যা ২০ শতাংশ করতে হবে।

১৪. নিয়োগ-সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা অনুমোদন দিতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা সিজিএর থাকতে হবে।

১৫. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.৫ প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত

১৬. সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা অনুমোদন দিতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের সাথে মিল রেখে যুগোপযোগী ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে প্রশিক্ষণ সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।

১৭. যে ব্যক্তির যে কাজে বেশি দক্ষতা রয়েছে, তাকে সেখানে কাজে লাগাতে হবে। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে নির্বাচন করতে হবে।

১৮. বিদেশে মিশন অডিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ দিতে হবে।

৫.৬ তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত

১৯. বছরে একবার সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং তা যাচাই করতে হবে। বৈধ সূত্রের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত আয় বা

সম্পদ আহরণ বা অন্য কোনোরূপ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০. সেবা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংযোজন করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে নাগরিক সনদটিকে পুনঃপ্রণয়ন করতে হবে। অভিযোগ দাখিল ও এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সম্পর্কিত তথ্য থাকতে হবে এবং হালনাগাদ করতে হবে। প্রতিটি সরকারি অফিসে এই নাগরিক সনদ পৌঁছে দিতে হবে।

২১. সব ধরনের আইন সম্পর্কে অবগত করার জন্য আইন ও আইনের সংশোধনীগুলো একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করতে হবে।

৫.৭ কার্যক্রম মনিটরিং-সংক্রান্ত

২২. সিজিএর জবাবদিহি নিশ্চিত করা ও কার্যক্রম মনিটর করার জন্য দক্ষ জনবলের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি সেল বা উইং গঠন করতে হবে।

২৩. অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে জুন মাসে সারা বছরের ২৫ শতাংশের বেশি বিল না পাঠানোর নির্দেশ দিতে হবে।

২৪. সিজিএ থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের কর্মকর্তারা যাতে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটর করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় বিল আটকে রাখলে তার জন্য সিজিএসহ অন্যান্য কর্মকর্তা তাকে ডেকে ব্যাখ্যা চাইবেন।

২৫. ‘পরিদর্শন-অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ’ শাখা ও ‘দক্ষতা-শৃঙ্খলা’ শাখায় দক্ষ জনবল নিয়োগ করে এ শাখাগুলোকে আরও কার্যকর করতে হবে। একই সাথে পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা এবং দক্ষতা-শৃঙ্খলা শাখার মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৬. ‘বিধি-পদ্ধতি’ শাখা ১ ও ২-কে একত্র করে একটি শাখায় পরিণত করতে হবে এবং এ শাখাটিকে দক্ষ জনবল ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা দিয়ে কার্যকর করতে হবে।

৫.৮ হিসাবরক্ষণ-সংক্রান্ত (দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা)

২৭. ধীরে ধীরে অ্যাক্রুয়ালভিত্তিক হিসাবরক্ষণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তা প্রয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক বিবরণ উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিতে উপস্থাপন করতে হবে। এর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর্থিক বিবরণ তৈরির প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তা বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

দিপু রায়

১. ভূমিকা

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংবিধানের ১২৮-এর (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সব আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন।' এ কার্যালয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা, কার্যকরতা ও মিতব্যয়িতা আনার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। সিএজি কার্যালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারি অর্থ দক্ষতার সাথে ব্যয় হচ্ছে কি না এবং এই ব্যয়ের ফলে আয়কর প্রদানকারী ও দরিদ্র মানুষের কী কী উপকার হচ্ছে তার বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পর্যালোচনা করা। এই কার্যালয়ের মাধ্যমে সংসদের প্রতি নির্বাহী বিভাগের এবং কর প্রদানকারীদের প্রতি সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়। এই কার্যালয়ের কার্যক্রমের ফলে গত ৫ বছরে ১৮ হাজার ৫২৭ দশমিক ৮৫ কোটি টাকা সমন্বয় ও উদ্ধার করা হয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন আনয়নে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গবেষণালব্ধ তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিএজি কার্যালয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে টিআইবি ২০০২ সালে এর ওপরে একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এরপর এই কার্যালয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন, যেমন নিরীক্ষা পদ্ধতিতে অটোমেশনের সংযোজন, প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিএজি প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ, খসড়া নিরীক্ষা অ্যাক্ট প্রণয়ন ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তন সম্ভব হলেও এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে এই কার্যালয় অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারছে না। অন্যদিকে এই কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে সঠিকভাবে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত না হওয়া এবং সরকারি কার্যালয়গুলোর নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যয় ও আত্মসাৎ করা অর্থের আদায় না হওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে সিএজি কার্যালয়ের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও বিস্তার বিশ্লেষণের জন্য টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

---

* ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সিএজি কার্যালয়ের আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত করা, এই কার্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও মাত্রা বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলো থেকে উত্তরণে পরামর্শ দেওয়া।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে- সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শীর্ষস্থানীয়সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুখ্য তথ্যদাতা, বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষণ। এ গবেষণায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বোর্ড ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪০টি সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা, সিজিএর প্রকাশনা ও ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট। মার্চ ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. আইনগত সীমাবদ্ধতা

সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদে রয়েছে 'রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহাহিসাব নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে।' কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯৭৪-এর অ্যাডিশনাল ফাংশনস অ্যাক্ট ১৯৮৩ সালে সংশোধন করে সেখানে (সেকশন ৩) উল্লেখ করে, সরকার ইচ্ছা করলে সিএজির নিরীক্ষা ক্ষমতা ও প্রাসঙ্গিক আরও যেসব ক্ষমতা রয়েছে তা স্থগিত করতে পারে। আর এই ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে সিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন কনট্রোলার জেনারেল অব অ্যাকাউন্টসকে (সিজিএ) মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনে ন্যস্ত করে। তবে সংবিধান সংশোধন না করে এই পরিবর্তন আনায় সিজিএর কাঠামোতে সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন- সিজিএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তারা এখনো সিএজির নিয়ন্ত্রণেই রয়েছেন এবং তাদের পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি সিএজির মাধ্যমেই হয়।

আবার ২০০৮ সালে সিএজির সাংবিধানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিরীক্ষা আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত হলেও এখন পর্যন্ত তা চূড়ান্ত হয়নি। ফলে সিএজি স্বাধীনভাবে কাজ করতে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন, নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিতে তারা প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে পারছে না। অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী উচ্চ আদালতের বিচারপতি এবং সিএজির মর্যাদা সমান হওয়ার কথা। তাই তো তাদের বাজেট, নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অথচ ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে উচ্চ আদালতের বিচারপতির মর্যাদা রাখা হয়েছে নবম পর্যায়ে, যেখানে সিএজিকে রাখা হয়েছে ৬ ধাপ নিচে, ১৫তম পর্যায়ে। এমনকি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে পরিচালিত সভায় সিএজিকে একজন সাধারণ সচিবের মর্যাদা দেওয়া হয়।

সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, সিএজির প্রতিবেদনগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। অন্যদিকে রুলস অব বিজনেসে বলা হয়েছে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছেও পেশ করতে হবে, যা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত হলো, প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত নন, সেহেতু তাকে এই প্রতিবেদন দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই; বরং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিএজির সাংবিধানিক ক্ষমতাকে লঙ্ঘন করা হয়।

সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠানের, যেমন- রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ইত্যাদি ক্রয়-সংক্রান্ত নিজস্ব নিয়মকানুন রয়েছে আবার সার্বিকভাবে রয়েছে সরকারি ক্রয়নীতি। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আইনকানুনের সাথে ক্রয়নীতির অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয় না থাকার কারণে সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি হয় না। ফলে সিএজি কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়।

সরকার বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন আদেশ জারি করে বা আইনের মধ্যে সংযোজন বা সংশোধন করে। কিন্তু এসব পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ না করার কারণে নিরীক্ষা দল বা সরকারি কার্যালয়গুলো 'জেনে বা না জেনে' এসব নিয়মের লঙ্ঘন করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়, যা দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তি হয় না।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা-অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীলতা

সংবিধানের ৮৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে সিএজির ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত করার মাধ্যমে সিএজির আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যয় সুনির্দিষ্ট করা না থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ-সংক্রান্ত আইনের বলে সিএজি কার্যালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবছর সিএজি কর্তৃক বাজেটকৃত পরিবহন ও দৈনিক ভাতার সম্পূর্ণটা অর্থ মন্ত্রণালয় বরাদ্দ দেয় না। আবার এক বছরের যাতায়াত ভাতা ও দৈনিক ভাতা-সংক্রান্ত বিলের অংশ পরের বছর দেওয়া হয়।

আবার আইন অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা সিএজির থাকলেও, বাস্তবে তাদের অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। পূর্ত, চিকিৎসা বা প্রকৌশল বিষয়ে নিরীক্ষা করতে সিএজি বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও কিছু ক্ষেত্রে এসব নিয়োগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া সিএজির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, শিক্ষা-সংক্রান্ত ছুটি ও ক্রয় ইত্যাদির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। একইভাবে যেকোনো নিয়োগ, পদোন্নতি, পুনর্গঠন বিষয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়।

জনবল-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

সিএজি কার্যালয়ে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। এখানে কাজের ব্যাপ্তির তুলনায় জনবলের সংখ্যা অনেক কম। ১৯৮৮ সালে অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম দ্বারাই বর্তমান সিএজির কার্যক্রম পরিচালিত

হচ্ছে। প্রতিবছর জাতীয় বাজেট এবং সরকারি কার্যালয়ের সংখ্যা ও কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই সঙ্গে সিএজির কাজের ক্ষেত্র বাড়লেও প্রয়োজনানুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পায়নি; বরং অনুমোদিত পদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শূন্য পদ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, মোট জনবলের মধ্যে প্রথম শ্রেণিভুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তার পদ রয়েছে মাত্র ১৩৫টি, যা মোট পদের মাত্র ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। সিএজির অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অধিদপ্তরের মাত্র ১০ জন ক্যাডার কর্মকর্তা প্রতিবছর প্রায় ৪০০টি প্রকল্প নিরীক্ষা করেন এবং স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তরের ১১ জন ক্যাডার কর্মকর্তা ১২,০০০টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করেন। এখান থেকে স্পষ্ট যে, এই স্বল্প জনবল দিয়ে অধিদপ্তরগুলোর পক্ষে এতগুলো প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষার কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও তা এখনো অনুমোদিত হয়নি।

সিএজি কার্যালয়ের কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য নিয়মানুযায়ী সাব-অর্ডিনেট অ্যাকাউন্ট সার্ভিস (এসএএস) পরীক্ষায় পাস করার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এসব পদোন্নতির জন্য সিএজি ২০০৩ সালে একটি নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও তা এখনো অনুমোদিত হয়নি। ফলে অনেক নিরীক্ষক ও সুপারিনটেনডেন্ট এসএএস পরীক্ষায় পাস করলেও পিএসসির অনুমোদনের অভাবে উচ্চ স্কেলের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। উদাহরণস্বরূপ, পিএসসির অনুমোদন না হওয়ার জন্য ২০০৭ সাল থেকে বর্তমানে প্রায় ৫৩৫ জন সুপারিনটেনডেন্ট প্রথম শ্রেণির এবং ২৫০ জন নিরীক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগ্যতার সাথে গ্রেডিং ও আর্থিক দিকটি সমন্বিত নয়। সম্প্রতি ২০১৩ সালে সিজিএ ও কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফিন্যান্সকে (সিজিডিএফ) গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ করা হলেও সমমর্যাদাসম্পন্ন ডেপুটি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ডিসিএজি) সিনিয়র ও মহাপরিচালক-ফিমাকে গ্রেড-২তেই রাখা হয়েছে। সিএজি কার্যালয় থেকে এই পদগুলোর গ্রেড উন্নয়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও এখনো তা অনুমোদিত হয়নি।

অন্যান্য ক্যাডারের সাথে সিএজি কার্যালয়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেডিংয়ের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে সিএজির কর্মকর্তাদের অনেকে দীর্ঘদিন (১০-১৫ বছর) ধরে নিরীক্ষা এবং হিসাবের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা সত্ত্বেও উচ্চ গ্রেডিংয়ের জন্য অন্য মন্ত্রণালয়ে চলে যাচ্ছেন এবং দীর্ঘদিন একই পদে কর্মরত থাকছেন। আবার নন-ক্যাডারদের সিলেকশন গ্রেডের ব্যবস্থা ১৯৯৮ সালে বাতিল করা হয়। এ ছাড়া সরকারের কিছু বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের যেমন- নার্স, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, সমবায় কর্মকর্তা, সাব রেজিস্ট্রারদের দ্বিতীয় শ্রেণির করা হলেও নিরীক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণি হওয়ার দাবি পূরণ হয়নি।

প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে ফিমার প্রশিক্ষণপদ্ধতিতে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তার পরও এখানে অনুশীলনভিত্তিক প্রশিক্ষণের চেয়ে লেকচারভিত্তিক প্রশিক্ষণের আধিক্য রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন মূল্যায়ন করা হয় না, প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় না এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম, পরিবর্তিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের ওপর

পৃথক কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। এ ছাড়া ফিমার প্রশিক্ষকদের অনেকের যোগ্যতায় বিশেষ ঘাটতি রয়েছে এবং অনেকে আন্তরিকতার সাথে প্রশিক্ষণ দেন না। অতিথি প্রশিক্ষকদের সম্মানীর পরিমাণ কম হওয়ায় তাদের অনেকে পর্যাপ্ত সময় দিতে চান না।

জবাবদিহির সমস্যা

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সিএজি নিয়োগ করলেও তার জবাবদিহির বিষয়টি সরাসরি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। আবার সিএজির কার্যক্রম ও প্রতিবেদন নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়ার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে কখনোই তা হয় না। তবে সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি) সিএজির নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করলেও সিএজির জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগত মান নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করে না।

জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির (ডিপিসি) মাধ্যমে সিএজির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হওয়ায় তাদের জবাবদিহি সিএজি কার্যালয়ের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া সিএজি কার্যালয়ে একটি অভিযোগ সেল থাকলেও কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কখনো কোনো বিষয়ে অভিযোগ করেননি।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

সিএজির নিরীক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। নিরীক্ষকরা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক নিরীক্ষা শেষে আপত্তি দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তার ব্যাখ্যা দেয় বা নথিপত্র সরবরাহ করে। এগুলো অস্পষ্ট বা আর্থিক নিয়মের সাথে যুক্তিপূর্ণ না হলে নিরীক্ষকরা পুনরায় ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠান। এর জবাব পেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ফলে নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন করা যায় না। অন্যদিকে পর্যাপ্ত নিরীক্ষা ব্যবস্থাপকের অভাবে কার্যকর তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সম্ভব না হওয়ায় অনেক সময় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভুল থাকে। আবার প্রতিবেদন তৈরি হলেও তা ছাপানোর জন্য অনেক সময় বিজি প্রেসের শিডিউল পেতে দেরি হয়। এ ছাড়া নিরীক্ষা করার সময় সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থবছরের সাথে আগের বছরের কাগজপত্রের ওপরও নিরীক্ষা আপত্তি দেওয়া হয়। এসব আপত্তি যখন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে পিএসির সভায় আলোচনার জন্য দেওয়া হয় তখন পুরোনো হওয়ার জন্য এসব আপত্তি গুরুত্ব হারায়। এ ছাড়া এই প্রতিবেদনের ওপর সিএজি কার্যালয়ের কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স টিমের ফিডব্যাক পেতে দীর্ঘ সময় (ক্ষেত্রবিশেষে এক বছরেরও বেশি সময়) লাগে। একইভাবে প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পরেও কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ পেতে প্রায় ছয় মাস সময় লেগে যায়। এভাবে কোনো প্রতিবেদন তৈরি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা পর্যন্ত প্রায় এক থেকে দেড় বছর লেগে যায়। সুতরাং পদে পদে দীর্ঘসূত্রতায় খুব সামান্য নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে একটি মন্ত্রণালয়ে মোট ১ লাখ ৫২ হাজার নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন দেওয়ার পরে এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতের জন্য ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বরের আগে কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতো না। ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। যেমন- সর্বশেষ ২০০৮ সালের কিছু প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে রয়েছে।

সংস্কারমূলক কার্যক্রমে সমস্যা

সিএজির কার্যক্রম ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রেই সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এর কারণ হলো, এসব প্রকল্পের বেশির ভাগই সিএজির প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রকল্প-ব্যয়ের বড় একটা অংশ পরামর্শকদের বেতন বাবদ চলে যায়। আবার এসব পরামর্শকের অনেকেরই আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতার অভাব লক্ষণীয়। অন্যদিকে দেশি পরামর্শক নিয়োগের কোনো বিধিমালা নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা যাদের দীর্ঘদিন ধরে হিসাবরক্ষণ কিংবা নিরীক্ষা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা নেই বা হালনাগাদ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দক্ষতার অভাব রয়েছে, তাদের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে তারা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে খুব দক্ষতা ও সফলতার সাথে কাজ করতে পারেন না।

সিএজির কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়ার (আপত্তি নিষ্পত্তি ও অর্থ আদায়ে) বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

নিরীক্ষা চলাকালীন সিএজি ও নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠানের নানা দুর্বলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে নিরীক্ষা নিষ্পত্তির হার খুবই কম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নিরীক্ষা নিষ্পত্তিতে পিএসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পিএসি আলোচনার মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মবহির্ভূত ব্যয় ও আত্মসাৎ করা অর্থ আদায় করতে সমর্থ হয়। তবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলোতে অনেক পুরোনো ঘটনা উল্লিখিত হওয়ায় নিরীক্ষা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন- ২০০৮-০৯ সালের প্রতিবেদন ২০১২ সালে জমা দেওয়ার কারণে নিরীক্ষা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেককেই আর জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, নবম সংসদের পিএসি ছাড়া কোনো পিএসিই এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেনি। স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত মাত্র ৩৩২টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবম সংসদের পিএসি পুরোনো ৪৯০ ও নতুন ১৫৮টিসহ মোট ৫৭০টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে, যদিও তাদের বিরুদ্ধে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির অভিযোগ রয়েছে।

৪. সিএজি কার্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিয়োগ ও পদায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

সংবিধানের ১২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সিএজি নিয়োগ দেবেন। কিন্তু ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া তার অন্য সব দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। এ ক্ষেত্রে একজন দলীয় ব্যক্তির সিএজি হিসেবে নিয়োগের আশঙ্কা থাকে। কারণ বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অনেক উদাহরণ রয়েছে। আর এসব দলীয় ব্যক্তির নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হয়।

সিএজি কার্যালয়ের কর্মচারী যেমন–নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক, এমএলএসএস নিয়োগে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, পিএসির সদস্যসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তদবির থাকে। ২০১৪ সালে সিজিডিএফের বিভিন্ন পদে মোট ৪১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যেখানে বড় অঙ্কের অর্থের লেনদেন হয়। নিরীক্ষক ও অধস্তন নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে অনেককেই ৪ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ ছাড়া ২০১২ সালে সিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (ফিন্যান্স) রেলওয়েতে প্রায় ৫০০ জন নিরীক্ষক ও অধস্তন নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ সময় প্রায় অর্ধেককেই প্রতিটি পদের জন্য ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতির সাথে সিএজি কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ রয়েছে এমন অধিদপ্তরে পদায়নের জন্য সরকারের উচ্চমহল থেকে তদবিরের প্রয়োজন হয়। যেমন– বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অধিদপ্তর, মিশন অডিট অধিদপ্তর, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে অতিরিক্ত অবৈধ অর্থ আদায়ের সুযোগ থাকায় এসব জায়গায় অনেকে পদায়ন পেতে চায়। আবার যেসব কার্যালয়ে নিরীক্ষা করলে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ বেশি, সেসব প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়। যেমন- বন্ডেড ওয়্যার হাউস, ডিফেন্স নিরীক্ষার পূর্ত কার্যক্রম। কখনো কখনো পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনকে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আবার সিএজি কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার (ডিএও) পদে পদায়ন পেতে সিএজি কর্মকর্তারা প্রায় ১ লাখ থেকে ২ লাখ টাকা ঘুষ দেন।

প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে অনিয়ম

স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে যেমন, বন্ধু ও ব্যাচমেটদের অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচন করা হয়। আবার প্রশিক্ষণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কারণে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয় না। বিদেশি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করা হয় না; বরং নির্দিষ্ট কিছু সুবিধাভোগী কর্মকর্তাই এসব সুযোগ পেয়ে থাকেন। কাজের সাথে সংগতি নেই এমন ব্যক্তিরাও এসব প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অন্যদিকে মিশন নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতির কারণে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় না।

দায়িত্বে অবহেলা

মহাপরিচালকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য সিএজি কার্যালয় থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। মহাপরিচালকরা সঠিকভাবে কার্যক্রম পালন করছেন কি না, তারা মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরি করছেন কি না ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট কোনো জবাবদিহি নেই। এ ছাড়া তাদের কাজের জন্য সিএজি কার্যালয় থেকে কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা নেই। ২০১১-১২ অর্থবছরের নিরীক্ষা ২০১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার নিয়ম থাকলেও ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এসে কতটি প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে–এ বিষয়ে মহাপরিচালকদের জবাবদিহি করা হয় না। তাদের জবাবদিহির ঘাটতির প্রভাব পড়ে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরও। আবার মহাপরিচালকরা যখন দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন, তখন বাস্তবিক পক্ষে তারা আর নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি করতে সক্ষম হন না।

মাঠপর্যায়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য সিএজির কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই মাঠপর্যায় থেকে নিরীক্ষা দল যতটুকু তথ্য নিয়ে আসে তার বাইরের কোনো তথ্য সিএজি কার্যালয়ে পাওয়া যায় না। ফলে এই নিরীক্ষা দলের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। আবার মাঠপর্যায়ের নিরীক্ষা আপত্তি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ে প্রতিটি স্তরে রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা। ফলে এসব আপত্তি নিষ্পত্তির হার অনেক কম। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল সঠিকভাবে অনুসরণও করা হয় না।

মাঠপর্যায়ে নিরীক্ষাকালীন অনিয়ম-দুর্নীতি

সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করেন এবং তাদের নানাভাবে হয়রানি করেন। প্রতিটি নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল দ্বারা হয়রানির ধরন প্রায় একই রকম। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই এই নিরীক্ষা দলকে ঘুষ বা উপঢৌকন, যাতায়াত খরচ ও খাবারের খরচ দিতে হয়। স্থানীয় পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষা দল কোনো কোনো নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের থাকার খরচ আদায় করেছে। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের সংখ্যা ও অর্থ ব্যয়ের সুযোগ বেশি এবং আপত্তির ধরন বেশি যৌক্তিক ও জোরালো তাদের থেকে অধিক পরিমাণ ঘুষ আদায় করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন হয় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে। ছোট বাজেট সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘুষ নিয়ে দর-কষাকষি না হলেও নিরীক্ষা শেষে নিরীক্ষা দলকে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আর বড় বাজেট ও প্রকল্পসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুষ নিয়ে সমঝোতা হয়ে থাকে এবং সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। নিরীক্ষা করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে জোরালো ও অধিক পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির ওপরে উত্থাপিত আপত্তি বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিগুলোই চূড়ান্ত হিসেবে নেওয়া হয়। এসব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের গ্রহণযোগ্য যুক্তি দিতে সমস্যা হয় না। কখনো কখনো নিরীক্ষা দল নিজেই আপত্তির উত্তর তৈরি করে দেয়। ফলে পরবর্তী সময়ে দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোতে এসব আপত্তি সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির তুলনায় অনিয়মের ওপরে বেশি আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং আপত্তির সংখ্যাও কমানো হয়।

মাঠপর্যায়ের নিরীক্ষার পরবর্তী সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি

নিরীক্ষা দল কর্তৃক মাঠপর্যায়ের প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠানকে চিঠির মাধ্যমে আপত্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং আপত্তির জবাব দিতে বলা হয়, যা দ্বিপক্ষীয় সভার (ওসিএজি প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হয়। আবার দ্বিপক্ষীয় সভায় অনিষ্পন্ন আপত্তিগুলো ত্রিপক্ষীয় (ওসিএজি, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি) সভায় আলোচনা করা হয়। উভয় সভাতেই কখনো কখনো সবগুলো আপত্তি একসাথে উত্থাপন করা হয় না, আপত্তির বিষয়ে সমাধান হলেও এই সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় না, ব্যাখ্যা যৌক্তিক হলেও গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফেলে রাখা হয়। ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোর জন্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে যাতায়াত খরচ, খাবার খরচ ছাড়াও চার-পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আরও একটি দুর্নীতির পথ হচ্ছে দীর্ঘদিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এর জন্য

পর্যটন এলাকায় দ্বিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা হয় এবং ১৫-২০ বছরের পুরোনো আপত্তি কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ লেনদেনের সার্বিক চিত্র

গবেষণায় দেখা গেছে, সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত খাতে ঘুষ লেনদেন বা আদায় করা হয়ে থাকে।

সারণি ১.১ : সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ লেনদেনের সার্বিক খাত

ক্রমিক নম্বর	ঘুষ প্রদানের খাত		সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট কাজের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
১	নিয়োগে দুর্নীতি (নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক ও ড্রাইভার নিয়োগ)		উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সিজিডিএফ)	৩,০০,০০০-৫,০০,০০০
			উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (এডিজি ফিন্যান্স-রেলওয়ে)	৩,০০,০০০-৪,০০,০০০
২	পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার সুযোগ		উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	৫০,০০০-১,০০,০০০
			অ্যাসোসিয়েশন	১০,০০০-২০,০০০
৩	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিমপ্রতি)		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে (বার্ষিক নিরীক্ষা)	৫০,০০০-১,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (বার্ষিক নিরীক্ষার বাইরের নিরীক্ষা)	৪,০০,০০০-৫,০০,০০০
			উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (মাসিক)	১০,০০০-২০,০০০
৪	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিমপ্রতি)		বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে	১% - ২% (বিলের)
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (বার্ষিক নিরীক্ষা)	৫০,০০০-১,০০,০০০
৫	সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিমপ্রতি)	সিএও	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০-১,০০,০০০
		জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক	৫,০০০-১০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- সরকারি কার্যালয় কর্তৃক	৩০,০০০-৪০,০০০
৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিমপ্রতি)		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা -কর্মচারী- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক	৫০,০০০-৫,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- শাখা কার্যালয় কর্তৃক	৫০,০০০-২,০০,০০০
৭	বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (প্রতি কোটিতে)	৫,০০,০০০
৮	প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী-পূর্ত-সংক্রান্ত কাজের জন্য	৫০,০০০-১,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী-রেশন খাতে	১,০০,০০০-১,৫০,০০০
৯	ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০-১,০০,০০০
১০	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	৪,০০০-৫,০০০
১১	দীর্ঘ দিনের পুরোনো আপত্তি নিষ্পত্তিতে		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (কমপক্ষে)	২০,০০০

৫. আগের গবেষণার সাথে তুলনামূলক চিত্র

টিআইবির আগের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ১৭টি নির্দেশকের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, সাতটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো না-কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সাতটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে একই রকম অবস্থা বিরাজ করছে এবং তিনটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৬. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, সিএজি সাংবিধানিক পদ হলেও বাস্তবে এর স্বাধীনতা বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা যেমন- জনবলের ঘাটতি ও সুযোগ-সুবিধার অভাবসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে ওসিএজির কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ে পরিচালনায় ঘাটতি, ওসিএজির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় অডিটে সঠিক চিত্র প্রতিফলিত না হওয়া এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওসিএজির নিরীক্ষা আপত্তির জবাব না দেওয়া এবং পিএসির সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ না নেওয়ায় অবৈধভাবে ব্যয় ও আত্মসাৎ করা অর্থ আদায় হচ্ছে না এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর জবাবদিহি ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ দিচ্ছে।

৭. সুপারিশ

৭.১ স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগের বিধিমালার অনুমোদন দিতে হবে।

২. সিএজিসহ এই কার্যালয়ের সব ধরনের নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে

৩. ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে সিএজিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতির সমমর্যাদা দিতে হবে। ডিসিএজি সিনিয়র ও এডিজি (ফিন্যান্স) রেলওয়ে ও ডিজি ফিমাকে গ্রেড-১, মহাপরিচালকদের গ্রেড-২ করাসহ নিচের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. ওসিএজিকে বাজেট, নিয়োগসহ সব বিষয়ে সাংবিধানিক স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চত করতে হবে।

৫. সিএজিকে তার অধীন, বিশেষ করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমসহ সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালো পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা ও দুর্নীতিসহ বিধিবহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সিএজি কার্যালয় থেকে নিরীক্ষার জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে, যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ে নিরীক্ষার কাজ সম্পাদনের জন্য ফলোআপ ও সুপারভিশন জোরদার করতে হবে।

৮. নিরীক্ষার প্রতিবেদন কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ ও কার্যকর করতে হবে।

৯. সিএজি কার্যালয়ের অভিযোগ সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জানানোর জন্য প্রচারণা চালানো এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. বছরে একবার সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং অবৈধ উৎস থেকে আয় করা অর্থের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দুর্নীতির তথ্য ব্রেকিং নিউজের মতো সিএজির ওয়েবসাইটে স্ক্রলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার দিনই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবেদনের তথ্য সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭.২ মধ্যমমেয়াদি সুপারিশ

১২. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির তথ্যগুলো সিএজি পিএসিকে দেবে, যাতে পিএসি এই দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ করতে পারে।

১৩. সিএজির প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো হাতে নিতে হবে এবং প্রকল্পগুলোর পরামর্শক নিয়োগের জন্য নিজস্ব নীতিমালা থাকতে হবে।

১৪. ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ করতে হবে এবং মাঠপর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য তাদের সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করতে হবে।

১৫. স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে দুটি আলাদা অধিদপ্তরে ভাগ করতে হবে।

১৬. জরুরি কার্যক্রমের (ক্রাস প্রোগ্রাম) মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. সিজিএ কার্যালয়ের সাথে সিএজি কার্যালয়ের অনলাইন সংযোগ থাকতে হবে, যাতে সিএজি নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়।

১৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা তৈরি করে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাতে হবে।

৭.৩ দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১৯. সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় ও হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা খুলতে হবে।

২০. নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা থেকে পারফরম্যান্স নিরীক্ষার দিকে যাওয়ার জন্য একটি কৌশল তৈরি করতে হবে এবং এর জন্য ধীরে ধীরে জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল : বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি*

শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস

১. ভূমিকা

স্বাধীনতা-পরবর্তী গত চার দশকে বাংলাদেশ একটি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছে। একই সাথে দুর্নীতির বিস্তার বাংলাদেশের এই উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহতভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দুর্নীতি রোধের উদ্দেশ্যে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুদ্ধাচারের সাথে জড়িয়ে আছে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সংবিধান ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন। সুতরাং শুধু দুর্নীতির উৎপাটন নয়; বরং সমাজে ও রাষ্ট্রযন্ত্রে একটি ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করার প্রত্যাশায় ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়। এখানে ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও বিভিন্ন মেয়াদি (স্বল্পমেয়াদি বা এক বছর, মধ্যমেয়াদি বা তিন বছর এবং দীর্ঘমেয়াদি বা পাঁচ বছর) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কাঠামোর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় নীতিগত এ দলিলটি কীভাবে সরকার ও প্রশাসনের জন্য অগ্রগণ্য, কার্যকর ও বাস্তবায়নমুখী একটি দলিল হতে পারে তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার ওপর দীর্ঘদিনের গবেষণা ও নীতিপর্যায়ে প্রচারণার অভিজ্ঞতা থাকায় টিআইবি এই কৌশলপত্রের ঘাটতি এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার মাধ্যমে সরকারকে কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ দলিলটি কতখানি পরিপূর্ণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতখানি যথার্থ তা পর্যালোচনা করা। কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা, বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা, কৌশলপত্রটির ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে সুপারিশ প্রদান করা। এ গবেষণাটি গুণবাচক তথ্যনির্ভর। পরোক্ষ তথ্যের প্রধান উৎস হলো, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল, কৌশলপত্রের স্বতন্ত্র পর্যালোচনা, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা ব্যবস্থাবিষয়ক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন। আর প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হলো মুখ্য তথ্যদাতা, যারা এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন, নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট এবং জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মকর্তা। এ ছাড়া খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল জানুয়ারি-মে ২০১৪।

---

* ২০১৪ সালের ২৯ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

৩. কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কাঠামো ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' এবং অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'নির্বাহী কমিটি' গঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' গঠিত হয়েছে। এই ইউনিটের নির্দেশনার আলোকে সব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান নৈতিকতা কমিটি গঠন করেছে, যেখানে একজন 'ফোকাল পয়েন্ট' নির্ধারণ করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে তিন পর্যায়ে আটটি, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি, গণমাধ্যম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুটি কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়েও কয়েকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নানাবিধ নির্দেশনা, পরামর্শ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের উদ্যোগ, তথ্য অধিকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ-সংক্রান্ত তিনটি উপকমিটি গঠন, কৌশলপত্র বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্তকরণ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও সুশাসন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মেয়াদ শেষ হলেও এখনো কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি। অন্যদিকে, যেসব প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদন জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করেছে তার ওপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ ছাড়া সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ নেওয়ার কথা থাকলেও এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি নেই। এমনকি উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক তিনটি কাজকে (ন্যায়পাল নিয়োগ, বিচারপতি নিয়োগে আইন/বিধি প্রণয়ন ও অ্যাটর্নি সার্ভিস অ্যাক্ট অনুমোদন) অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এখনো নৈতিকতা কমিটি গঠিত না হওয়ায় সার্বিকভাবে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৫. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিকল্পনায় অগ্রগতি বিশ্লেষণ

কৌশলপত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন–বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রভাব, অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিরোধী দলের অসহযোগিতা, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া, বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় না থাকা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ থাকায়

প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বা চলমান রয়েছে। যেমন- ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার ওয়েবসাইটসমৃদ্ধ ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল তৈরি এবং ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম চালু, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত, অধিকাংশ জেলায় নির্বাচন কমিশনের সার্ভার স্টেশন চালু, সোশ্যাল পারফরম্যান্স অডিট চালুর উদ্যোগ, দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধে মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। আবার কিছু কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। যেমন- অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির খসড়া হলেও প্রবর্তিত হয়নি, সরকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পদের বিবরণ কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদানে কোনো অগ্রগতি নেই, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণীত হয়নি, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন ও রিসোর্স সেন্টার নির্মিত হয়নি, কর্মকমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেই, ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি, দুদক আইন সংশোধনের মাধ্যমে দুদককে দুর্বল করা হয়েছে, উপজেলা ও জেলা পরিষদে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণে এখনো আইনি সংস্কার করা হয়নি।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিভিল সার্ভিস আইনের খসড়া প্রণীত হলেও মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পায়নি, বেসরকারি বিল হিসেবে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংসদে উত্থাপিত হলেও তা অনুমোদিত হয়নি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে, অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইনের খসড়া হলেও তা এখনো অনুমোদিত হয়নি, নিরীক্ষা আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের স্বশাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, দুদকের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিশনার নিয়োগ, মামলা দায়ের ও প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

৬. অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিকল্পনায় অগ্রগতি বিশ্লেষণ

অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া এখনো প্রণীত না হওয়ায় রাজনৈতিক দল, বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সুশীল সমাজ, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট কোনো নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়নি এবং ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এনজিও ও সুশীল সমাজ খাতের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উদ্যোগে কয়েকটি এনজিওর সহায়তায় একটি খসড়া প্রণয়ন করে তার ওপর মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে। তার পরও এসব প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, দলের অভ্যন্তরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যাশিত পর্যায়ের গণতন্ত্রচর্চার ঘাটতি রয়েছে, প্রার্থী মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ও অর্থের প্রভাব বিরাজমান এবং দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত এবং খাদ্যে

ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে উপকমিটি গঠিত হলেও এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম, শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ উৎসাহ প্রদানে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়, পিআইবির জনবল-সংকট ও বাজেট স্বল্পতা রয়েছে, প্রশিক্ষণের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নেই, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রেস কাউন্সিলের আইনি সীমাবদ্ধতাসহ পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক বরাদ্দ ও লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নে কিছু এনজিও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এজন্য সার্বিক কোনো কাঠামো বা পদ্ধতি নেই এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য কমিশনের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিক

এই কৌশলপত্রে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করতে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধনের বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষত পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে সেই অনুযায়ী সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নে কয়েক স্তরবিশিষ্ট বাস্তবায়ন কাঠামো দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও আইনি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল বৃদ্ধি, তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা, কার্যকরতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বারোপ এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে এই কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের ঘাটতি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দুর্নীতি রোধে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘাটতি এই দলিলের বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।

ক. শুদ্ধাচারভিত্তিক মৌলিক সূচকের অনুপস্থিতি : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত মৌলিক সূচক, যেমন–স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা সব প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

খ. দুর্নীতিরোধে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের অনুপস্থিতি : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটির পটভূমিতে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কথা যৌথভাবে একাধিকবার বলা হলেও দুদক ছাড়া

অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় দুর্নীতিরোধে অগ্রাধিকারমূলক কোনো কার্যক্রম বা সুপারিশ প্রদান করা হয়নি। কৌশলপত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার পথে দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস থাকলেও বর্তমানে সুবিস্তৃত দুর্নীতিরোধে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

গ. জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া : জাতীয় সততা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান, যেমন–তথ্য কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ঘ. কৌশলপত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতি : নির্বাহী বিভাগের অধীনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনী থাকলেও তাদের গুরুত্ব বিবেচনায় পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আওতায় শুধু জনপ্রশাসন-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা করা হয়নি।

ঙ. কৌশলপত্রে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি : আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

চ. মন্ত্রণালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অস্পষ্টতা : মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা অনুবিভাগ থাকলে তাদের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা কবে, কীভাবে প্রণীত হবে, সেগুলোর বাস্তবায়নে কে বা কারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় কীভাবে করা যাবে, সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় কিরূপ হবে, ইত্যাদি বিষয়ে কৌশলপত্রে কোনো নির্দেশনা দেওয়া নেই।

ছ. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়নের এখতিয়ার মূল্যায়িত না হওয়া : কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম কি না বা তাদের এখতিয়ার আছে কি না, অনেক ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়নি। আবার অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও সহায়তাকারীর ভূমিকা দেওয়া হলেও তারা এসব কাজের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম কি না, তার কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি।

জ. কৌশলপত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমের প্রাধান্য : রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিকল্পনায় বর্তমানে তাদের চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন–নির্বাচন কমিশনের চলমান কার্যক্রম একটি ছকে ফেলে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। ফলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব কমে গেছে।

ঝ. সুপারিশের সাথে কর্মপরিকল্পনার সামঞ্জস্যহীনতা : কোনো প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে সুপারিশ দেওয়া হলেও তা অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়নি। যেমন–বিচার বিভাগের আলোচনায় স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে, 'জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন' এবং নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আলোচনায় স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে 'প্রতিবছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা' কিন্তু এসব কার্যক্রম অর্জনে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদক সূচক প্রদান করা হয়নি।

ঞ. গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের অনুপস্থিতি : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চলমান দুর্নীতির বিস্তার রোধে কোনো সুপারিশ করা হয়নি। এ ছাড়া শুদ্ধাচারের প্রধান সূচকগুলো (স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি) অর্জনের জন্য কোনো সুপারিশ নেই। যেমন–সরকারি কর্মকমিশনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো 'দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা', যা এখানে নেই।

ট. চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে দিকনির্দেশনার অনুপস্থিতি : কৌশলপত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় গুরুত্বসহকারে চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলেও কিছু ক্ষেত্রে তা থেকে উত্তরণে কোনো সুপারিশ বা কার্যক্রম দেওয়া হয়নি। যেমন–জাতীয় সংসদের আলোচনায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা'। কিন্তু কীভাবে এ থেকে উত্তরণ সম্ভব, তা সুপারিশ বা কর্মপরিকল্পনায় আলোচিত হয়নি।

ঠ. কর্মসম্পাদনের নির্ধারিত সময়সীমা সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নয় : কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা অর্জনে নির্ধারিত সময়সীমা অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নয়। এখানে স্বল্পমেয়াদি বলতে এক বছর, মধ্যমেয়াদি বলতে তিন বছর ও দীর্ঘমেয়াদি বলতে পাঁচ বছর সময়কাল নির্দিষ্ট করা হলেও নির্ধারিত সময়সীমাকে লক্ষ করে কোনো কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনায় সময় নির্ধারণে অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে গেছে। যেমন–অ্যাটর্নি জেনারেলের ৫ নম্বর কর্মপরিকল্পনা 'দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি' বাস্তবায়নে একই সাথে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় সংসদের ২ নম্বর কর্মপরিকল্পনা 'বিরোধীদলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ' বাস্তবায়নে চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ড. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা না করে কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত : কৌশলপত্রে উল্লিখিত কিছু কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন–সিএজি কার্যালয়ের সাথে আলোচনা না করে নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

ঢ. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি : এই কৌশলপত্রে ন্যায়পাল, রাজনৈতিক দল, পরিবার ও গণমাধ্যমের বিষয়ে সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ থাকলেও এসব কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। এটি বিভিন্নমুখী রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নীতিগত সংস্কার ও এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সময়সীমার নিরিখে খুব বেশি সময় না হলেও যেকোনো সংস্কারমূলক কার্যক্রমের শুরুতেই তার চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এখানে তুলে ধরা হলো।

ক. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার অভাব : কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা পায়নি। অন্যদিকে, এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো আর্থিক বরাদ্দ নেই। তাই তাদের পক্ষে এটি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মিলিত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আবার, কারিগরি সহায়তার দিকগুলোও চূড়ান্ত হয়নি।

খ. অংশীজনদের মধ্যে শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব : কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতির পেছনে রয়েছে এটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অংশীজনদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধ বা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিস্পৃহতা, দীর্ঘদিনের আমলাতান্ত্রিক কর্মসংস্কৃতির বাইরে নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করার মানসিকতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, তথ্যের অবাধ প্রবাহে বাধা, তথ্য সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি ।

গ. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাব : সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড নির্ভর করতে পারে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ওপর। তাই কোনো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, সমন্বয় এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলেও আমাদের দেশে এ ধরনের সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

ঘ. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতাকে প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব না দেওয়া : কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধু প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থাকায় কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে এটি অগ্রাধিকার পায় না। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে না পারে বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে তা তাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ জন্য কোনো শাস্তিমূলক বা বাধ্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে বা সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটি কীভাবে তাদের জবাবদিহি করবে–এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

ঙ. ফোকাল পয়েন্টদের বদলি বা ভিন্ন পদে পদায়ন : একটি প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বদলি হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেলে তার কর্ম-এলাকা, বিষয়, এখতিয়ার ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতে তিনি যে প্রতিষ্ঠান ছাড়ছেন সেখানে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। আবার নতুন কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে এবং নতুন কর্মকর্তার সদ্য পদায়িত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বুঝে নিতে বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক সময় লাগতে পারে। ফলে ওই প্রতিষ্ঠানে যেভাবে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের কাজ চলছিল, সেখানে নতুন নেতৃত্ব আসাতে কিছুটা ধীরগতি আসতে পারে।

চ. বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল ও লজিস্টিকসের স্বল্পতা : 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট'-এর জনবল ও লজিস্টিকস কম থাকায় শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণ, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়।

ছ. নৈতিকতা কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত না হওয়া : কিছু প্রতিষ্ঠানে এখনো 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হয়নি। যেমন– বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট) এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে। অন্যদিকে, অনেক মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হলেও ওই সব মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে 'শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' গঠিত হয়নি। এ ছাড়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে, নিযুক্ত ফোকাল পয়েন্ট বদলি হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়ায় নতুন ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করতে অনেক সময় লেগেছে।

জ. নৈতিকতা কমিটির এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট নয় এবং তাদের সক্রিয়তার অভাব : নৈতিকতা কমিটির সব সদস্য এই কৌশলপত্রের বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি বা তারা অংশগ্রহণ করেননি। ফলে তারা তাদের এখতিয়ার সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে অবহিত না।

ঝ. মূল দায়িত্বের চাপে বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা করতে না পারা : কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কোনো প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি তাদের নিয়মিত কাজের চাপে অনেক ক্ষেত্রেই শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত কাজ করতে পারে না। এমনকি সভাও করতে পারে না। তা ছাড়া নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টকে সর্বদা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় এবং অগ্রাধিকার কম থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই তারা এ-সম্পর্কিত অনুমতি পান না।

ঞ. নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ না করা বা দীর্ঘসূত্রতা : জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রতিষ্ঠানগুলোর নৈতিকতা কমিটি তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি জানানোর নিয়ম থাকলেও এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান তা করেনি।

ট. জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের এখতিয়ার ও সক্রিয়তার অভাব : জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করার কথা থাকলেও এখনো কিছু প্রতিষ্ঠানকে যেমন, সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে কোনোরূপ নির্দেশনা দেয়নি।

ঠ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন : কৌশলপত্রের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসরণ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের অধীন বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর থাকলে তাদের জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ড. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা : এনজিও ও বেসরকারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এখনো কোনো নির্দেশনা বা পদ্ধতি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে স্বশাসন থাকায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঢ. অংশীজনদের মধ্যে কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা : কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হলেও কৌশলপত্র প্রণয়নের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নৈতিকতা কমিটির অনেক সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি।

ণ. স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের সময়সীমা শেষ হলেও এখনো তার মূল্যায়ন না হওয়া : কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর পার হলেও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্মকৌশলে উল্লিখিত স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেনি।

ত. শুদ্ধাচারে উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সহায়তাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব : কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও সহায়তাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কৌশলপত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন-সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন আবার রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হলো নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাদের এই দ্বৈত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি।

থ. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতার অভাব : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় তথ্যদাতাদের কাছ থেকে তাদের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তারা শুধু কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত।

দ. জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়মিত না হওয়া : কৌশলপত্রে এই উপদেষ্টা পরিষদের বছরে ন্যূনতম দুটি সভা করার কথা থাকলেও দীর্ঘ দেড় বছরে একটি মাত্র সভা হয়েছে। এ ছাড়া এ পরিষদের নির্বাহী কমিটিও একটি মাত্র সভা করেছে।

১০. সুপারিশ

বিকাশমান দলিল হিসেবে বাস্তবায়নের প্রথমেই কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা বিচার, প্রতিষ্ঠানের মালিকানাবোধ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই এবং বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হলে এই দলিলটিকে আরও বেশি বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য উপযুক্ত দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে টিআইবি নিম্নলিখিত কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করছে :

১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে সব রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার করতে হবে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ সভা, কর্মশালা আয়োজন এবং এটি সম্পর্কে সুশীল সমাজ ও জনগণকে অবহিত করতে হবে।

২. জনবল বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত লজিসটিকস সরবরাহ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে কাঠামোগত ও ধারণাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটকে অতিদ্রুত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে।

৩. যেসব রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি ও শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়নি এবং ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারিত হয়নি তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এসব কমিটির সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিত সভা আয়োজন করবে, সদস্যদের সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৪. সব অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, উপায় বা প্রক্রিয়া অতিদ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

৫. প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য আর্থিক বরাদ্দ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়নের বিধান রেখে নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রমকে প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে।

৬. জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ, নির্বাহী কমিটি এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নৈতিকতার কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার স্তম্ভগুলোকে যেমন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সামরিক বাহিনীকে কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় শুদ্ধাচারের প্রধান সূচক এবং দুর্নীতি রোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটির চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে অতিদ্রুত এটিকে হালনাগাদ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান

গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১২ : বাংলাদেশ প্রতিবেদন*

মো. শাহ্নূর রহমান ও মোহাম্মদ নূরে আলম

১. ভূমিকা

গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার, সংক্ষেপে জিসিবি নামে অভিহিত। দুর্নীতির ওপর পরিচালিত একমাত্র জনমত জরিপ, যা বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতি পরিমাপের বিভিন্ন গবেষণা ও সূচকের[৬৯] মধ্যে এটি অন্যতম। এই জরিপের মাধ্যমে দুর্নীতির ওপর বৈশ্বিকভাবে সাধারণ জনগণের ধারণা, অভিজ্ঞতা ও মতামতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া এ জরিপে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির প্রভাব নিরূপণ করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি রোধে গৃহীত পদক্ষেপ নিরূপণে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অভিজ্ঞতা এবং দুর্নীতি বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর এ জরিপ কাজটি পরিচালনা করে আসছে। সাম্প্রতিক জরিপটি[৭০] পৃথিবীর ১০৭টি দেশে ১১৪,২৭০ জন ব্যক্তির মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় (বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা) এ জরিপে আট হাজারের বেশি লোকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.১ জরিপের যৌক্তিকতা

দুর্নীতির ওপর জনগণের ধারণা, অভিজ্ঞতা ও মতামত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বৈশ্বিকভাবে চিহ্নিত। এটা অনস্বীকার্য যে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রদানে জনগণই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

---

* ২০১৩ সালের ৯ জুলাই ঢাকায় প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[৬৯] যেমন : দুর্নীতির ধারণাসূচক, ঘুষদাতা সূচক, গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ইত্যাদি। **দুর্নীতির ধারণাসূচক** হচ্ছে বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, ব্যবসায় ও প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তারের ওপর ধারণার তুলনামূলক প্রতিফলন। এটি ১০-১৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা সম্পন্ন জরিপের ভিত্তিতে তৈরি সূচক। এর আওতা মূলত জাতীয় পর্যায়ের বড় আকারের দুর্নীতি (Grand Corruption)। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/; **ঘুষদাতা সূচক** হচ্ছে বেসরকারি খাতের ঘুষের মাত্রা নিরূপণের একটি সূচক। এর মাধ্যমে বিশ্বের বৃহৎ কোম্পানিগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী মাত্রায় ঘুষের আশ্রয় নেয় তা নিরূপণ করা হয়। এ জরিপের উত্তরদাতা হচ্ছেন বিশ্বের বৃহৎ কোম্পানিগুলোর বিজনেস এক্সিকিউটিভরা।
বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.transparency.org/research/bpi/overview;
গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় বা খাতের ওপর গবেষণা প্রতিবেদনের সংকলন। ২০১১ সালের গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ছিল জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এবং আগের বছরের রিপোর্টগুলো ছিল বেসরকারি খাত, পানি, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর।
বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.transparency.org/research/gcr

[৭০] টিআই কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে এটিকে বলা হয়েছে 'গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১৩'; তবে বাংলাদেশ প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের তথ্যসমূহের রেফারেন্স কাল ২০১২ (ক্ষেত্র বিশেষে ২০১১-১২) হওয়ায় এটিকে বাংলাদেশ প্রতিবেদনে 'গ্লোবাল করাপশন ব্যারেমিটার ২০১২ : বাংলাদেশ প্রতিবেদন' বলা হয়েছে।

সাধারণ জনগণ। টিআই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যেহেতু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির শিকার সাধারণ জনগণ, তাই জনগণের এ-সম্পর্কিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু টিআই দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। এই জরিপ দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিরূপণ তথা আগ্রহের মাত্রা যাচাইয়ে সহায়ক হবে।

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈশ্বিকভাবে দুর্নীতির ওপর সাধারণ জনগণের ধারণা, অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- সাধারণভাবে দুর্নীতির মাত্রা সম্পর্কে জনগণের ধারণা, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাত বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির ধারণার মাত্রা নিরূপণ করা।
- অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন সেবা খাত বা প্রতিষ্ঠানে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার নিরূপণ করা ও এর কারণগুলো চিহ্নিত করা।
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মতামত এবং দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণের আগ্রহের মাত্রা যাচাই করা।

১.৩ জরিপের পরিধি

- গত দুই বছরে (২০১১-২০১২) সার্বিকভাবে একটি দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার মাত্রা;
- নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতির মাত্রা সম্পর্কে ধারণা;
- নির্বাচিত সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার ও এর কারণ;
- দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকরতা;
- দুর্নীতির ঘটনা অবহিত করার ক্ষেত্রে একটি দেশের জনগণের আস্থার ক্ষেত্র ও
- দুর্নীতি প্রতিরোধে জন-অংশগ্রহণের আগ্রহের মাত্রা।

১.৪ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বনাম ধারণা

- 'গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১২'তে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বলতে মূলত ব্যক্তি বা খানার ক্ষুদ্র আকারের দুর্নীতির (petty corruption) প্রত্যক্ষ (direct) অভিজ্ঞতাকে বোঝানো হয়েছে।

- অপরদিকে দুর্নীতির ধারণা বলতে সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রপর্যায়ে দুর্নীতির বিষয়ে সার্বিকভাবে উত্তরদাতাদের যে ধারণা (perception) তা বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা ক্ষুদ্র আকারের দুর্নীতির পাশাপাশি বৃহৎ আকারের দুর্নীতিও (grand corruption) বিবেচনায় নিয়েছেন। উত্তরদাতার ধারণা (perception), তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াও মিডিয়া, অন্যান্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও মতামত দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

১.৫ জরিপ পদ্ধতি

জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল কমপক্ষে এক হাজার ব্যক্তির কাছ থেকে অভিন্ন কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপের নমুনায়নের ক্ষেত্রে Probability Sampling পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বেশির ভাগ দেশে Gallup International/WIN এর সহায়তায় জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ জরিপের তথ্য সংগ্রহ করে। প্রায় অধিকাংশ দেশেই মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিছু দেশে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এবং কম্পিউটার অ্যাসিসটেড টেলিফোনিক ইন্টারভিউয়ের (CATI) মাধ্যমে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৫.১ বাংলাদেশে জরিপ পরিচালনা ও উত্তরদাতা নির্বাচন

বাংলাদেশে উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপোজ স্যাম্পলিং (IMPS) ফ্রেমের অনুসরণে ২০০ পিএসইউ দৈবচয়িতভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১৮টি স্তরে (strata) বিস্তৃত। নির্বাচিত পিএসইউ থেকে সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং অনুসরণ করে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ১০টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত খানা থেকে Kish Grid পদ্ধতির মাধ্যমে ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের দুই হাজার উত্তরদাতাকে নির্বাচন করা হয়। সার্বিকভাবে মোট ১৮২২টি (৯১ দশমিক ১ শতাংশ) খানার নির্বাচিত উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। হরতাল, উত্তরদাতাদের অনুপস্থিতি বা অস্বীকৃতির কারণে মোট ১৭৮টি (৮ দশমিক ৯ শতাংশ) খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১.৬ জরিপের সময়কাল

বৈশ্বিকভাবে তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল সেপ্টেম্বর ২০১২-মার্চ ২০১৩। বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্যগুলোর 'রেফারেন্স কাল' (reference period) ছিল ২০১২ (ক্ষেত্রবিশেষে ২০১১-১২)।

১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এ জরিপটি ২৫ জন তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে (২০ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও পাঁচজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক) গঠিত মোট পাঁচটি তথ্য সংগ্রহকারী দলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ে গঠিত প্রতিটি দল ১২-১৩টি জেলার নির্বাচিত খানাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্যসংগ্রহকালীন প্রতিটি দলের দৈনন্দিন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের একজন করে গবেষক সব সময় তথ্যসংগ্রহকারী দলের সাথে অবস্থান করেছেন। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্যপূরণে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে, সে বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। ফিল্ড টেস্টে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পরিমার্জিত করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। তথ্যসংগ্রহকালীন প্রতিটি দলের দৈনন্দিন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের একজন করে গবেষক সব সময় তথ্যসংগ্রহকারী দলের সাথে অবস্থান করেছেন। এ ছাড়া তত্ত্বাবধায়করা নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। টিআইবির গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাছাই করে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ১৯ দশমিক ২ শতাংশ, ব্যাক চেক ৭ দশমিক ২ শতাংশ, স্পট চেক ১২ দশমিক ২ শতাংশ)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, প্রশ্নমালা চেক করা হয়েছে শতভাগ। এ জরিপের পদ্ধতি চূড়ান্তকরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন পরিসংখ্যানবিদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মধ্যে মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। মাঠপর্যায়ে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছে এমন ছয়জন তথ্যসংগ্রহকারীকে প্রশ্নমালা এডিটিং এবং রি-কোডিংয়ের কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ দলটি প্রশ্নমালা থেকে সব ধরনের অসামঞ্জস্য দূর করে। এরপর ছয়জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারে উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়। এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ১০ শতাংশ দৈবচয়ন ভিত্তিতে পুনঃ যাচাই করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি এশটি ডিজাইন বেজসড সার্ভে বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন বা মান নিরূপণ করার জন্য ভর (weight) ব্যবহার করা হয়[৭১]। পরবর্তী সময়ে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এন্ট্রি করা ডাটাবেস টিআই সেক্রেটারিয়েটের গবেষণা বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

২. উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে উত্তরদাতাদের ৬১ দশমিক শূন্য শতাংশ পল্লী অঞ্চলে এবং ৩৯ দশমিক শূন্য শতাংশ শহর অঞ্চলে বসবাস করেন। উত্তরদাতাদের ৬২ দশমিক ১ শতাংশের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, ৫১ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতা, ২৫ বছরের নিচে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ উত্তরদাতা এবং বাকি ৪ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে। উত্তরদাতাদের ২৭ দশমিক ১ শতাংশ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং শুধু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন উত্তরদাতাদের ২৭ দশমিক ১ শতাংশ। ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ

[৭১] weight=1/p, যেখানে p=p1*p2*p3; p1=selection probability of urban and rural, p2=probability of selecting a PSU under a domain, p3= selection probability of a household in a block | পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

উত্তরদাতা মাধ্যমিক পর্যায়, ৬ দশমিক ৮ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৮ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা উচ্চশিক্ষা বা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের পেশাগত অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ উত্তরদাতা গৃহিণী, শিক্ষার্থী, অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি; ১৪ দশমিক ৪ শতাংশের পেশা খানার নিজস্ব ব্যবসা (কৃষি), ১২ দশমিক ৬ শতাংশ খানার নিজস্ব ব্যবসা (অকৃষি) এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১ দশমিক ৫ শতাংশ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। উত্তরদাতাদের খানার মাসিক আয় (করবহির্ভূত) বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৩ দশমিক শূন্য শতাংশ খানার মাসিক আয় গড় আয়ের সমান, ৩৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানার মাসিক আয় গড় আয়ের চেয়ে অনেক কম এবং ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানার আয় গড় আয়ের থেকে কিছুটা কম। অপরদিকে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানার আয় গড় আয়ের থেকে কিছু বেশি এবং গড় আয়ের থেকে অনেক বেশি ৫ দশমিক ২ শতাংশ খানার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের খানার গড় মাসিক আয় প্রায় ১৪ হাজার ৫০০ টাকা (তথ্যসূত্র : বিবিএস, ২০১০)।

চিত্র ১ : উত্তরদাতাদের খানার করবহির্ভূত মাসিক আয় (%)

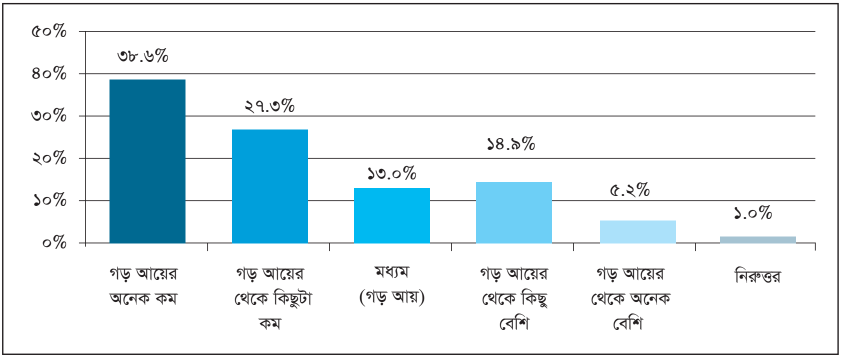

৩. জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল

৩.১ দুর্নীতি বিষয়ে সাধারণ জনগণের ধারণা

৩.১.১ গত দুই বছরে দুর্নীতির মাত্রার পরিবর্তন

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল গত দুই বছরে (জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১২) দুর্নীতির মাত্রার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না। এখানে দুর্নীতির মাত্রার পরিবর্তন বলতে দুর্নীতি কমতে পারে বা বাড়তে পারে তা বোঝানো হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা দুর্নীতি বেড়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১০ এবং ২০১২-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে দুর্নীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গত দুই বছরে জনগণের ধারণা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের জরিপে উত্তরদাতাদের ৪৬ শতাংশ দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

চিত্র ২ : গত দুই বছরে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি (%)

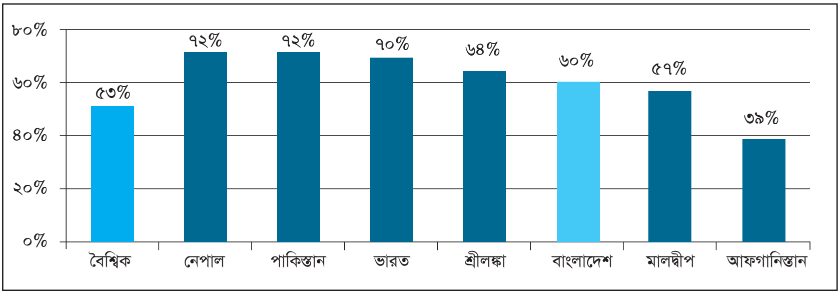

বৈশ্বিকভাবে উত্তরদাতাদের ৫৩ শতাংশ মনে করেন গত দুই বছরে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০১০ সালে এই হার ছিল ৫৬ শতাংশ। অপরদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় নেপাল ও পাকিস্তানে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে বলে মত প্রকাশের হার সর্বাধিক, যা উভয় দেশেই ৭২ শতাংশ, আফগানিস্তানে সবচেয়ে কম, যা ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন।

৩.১.২ *সরকারি খাতে দুর্নীতি সমস্যার মাত্রা*

এই জরিপে সরকারি খাতে দুর্নীতির সমস্যার মাত্রা ১ থেকে ৫ স্কেলে[৭২] জানতে চাওয়া হয়েছিল। এখানে সরকারি খাত বলতে সরকারি মালিকানাধীন ও সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং সেবাগুলো বোঝানো হয়েছে। সরকারি খাতে দুর্নীতিকে একটি গুরুতর ও খুবই গুরুতর সমস্যা মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের হার বিশ্লেষণে দেখা যায় বৈশ্বিকভাবে ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা এটিকে গুরুতর ও খুবই গুরুতর সমস্যা বলে মনে করেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই হার ৭৬ শতাংশ। আঞ্চলিক বিশ্লেষণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে সরকারি খাতে দুর্নীতি একটি গুরুতর ও খুবই গুরুতর সমস্যা মনে করার হার সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানে, যা ৯১ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম শ্রীলঙ্কায়, যা ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন।

চিত্র ৩ : সরকারি খাতে দুর্নীতি একটি গুরুতর ও খুবই গুরুতর সমস্যা বলে মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের হার

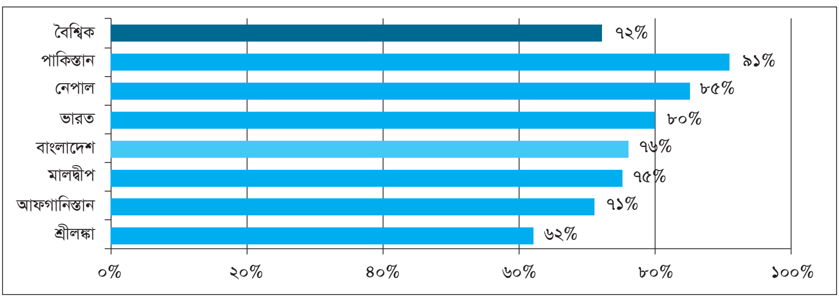

[৭২] যেখানে ১= সরকারি খাতে দুর্নীতি কোনো সমস্যা নয়, ২= কম সমস্যা, ৩= মোটামুটি সমস্যা, ৪= গুরুতর সমস্যা এবং ৫= খুবই গুরুতর সমস্যা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ২৪ শতাংশের মধ্যে ১৫ শতাংশ মনে করেন সরকারি খাতে দুর্নীতি একটি মোটামুটি সমস্যা, ৬ শতাংশ মনে করেন এটি কম সমস্যা এবং ৩ শতাংশ উত্তরদাতা বাংলাদেশে সরকারি খাতে দুর্নীতি কোনো সমস্যা নয় বলে মনে করেন।

৩.১.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা পেতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের গুরুত্ব

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা পেতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের গুরুত্বের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অপরদিকে ৯৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এটি বিভিন্ন মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সর্বাধিক ৪০ শতাংশ মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৪ : বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের গুরুত্ব (%)

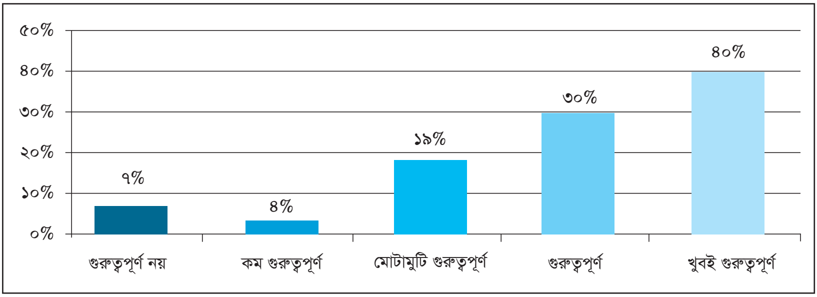

বৈশ্বিকভাবে এ ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। আঞ্চলিকভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করার সর্বাধিক হার লক্ষ করা যায় পাকিস্তানে (৪৬ শতাংশ) ও নেপালে (৪২ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন আফগানিস্তানে (১৯ শতাংশ)।

৩.১.৪ সরকার বিশেষ মহলের স্বার্থে কতটুকু পরিচালিত বা প্রভাবিত

সাধারণভাবে সরকারের দায়িত্ব হলো দেশের সব নাগরিকের স্বার্থ সমানভাবে দেখা। এ জরিপে একটি দেশের সরকার কতটুকু বিশেষ মহলের স্বার্থে পরিচালিত হয় এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল। এখানে বিশেষ মহলের স্বার্থ বলতে রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক, বিশেষ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। জরিপে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সরকার বিশেষ মহলের স্বার্থে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হয়। অপরদিকে বৈশ্বিকভাবে উত্তরদাতাদের ৯৩ শতাংশ মনে করেন তাদের দেশের সরকার বিশেষ মহলের স্বার্থে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হয়। আঞ্চলিক বিশ্লেষণে দক্ষিণ এশিয়ার জরিপের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো দেশের সরকার ব্যাপকমাত্রায় প্রভাবিত। তথাপি এই প্রভাবিত হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি নেপালে (৯৯ শতাংশ) এবং কম বাংলাদেশে (৯০ শতাংশ)।

চিত্র ৫ : বিশেষ মহলের স্বার্থে সরকারের প্রভাবিত হওয়ার হার (%)

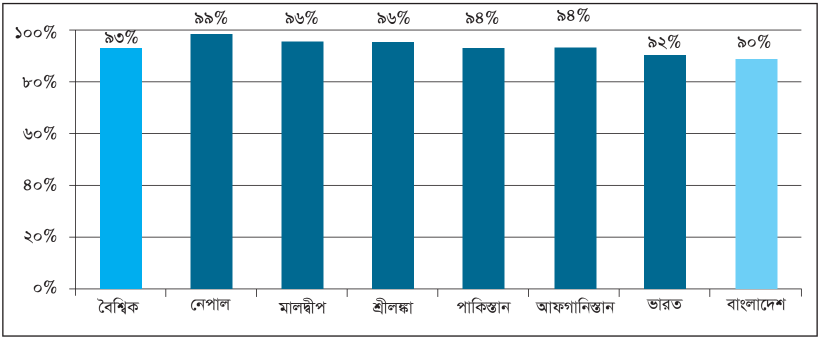

অপরদিকে বাংলাদেশের উত্তরদাতাদের (৯০ শতাংশ) যারা মনে করেন সরকার বিশেষ মহলের স্বার্থে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হয়, তাদের তুলনামূলক হার বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯ শতাংশ সম্পূর্ণ প্রভাবিত, ৩৭ শতাংশ ব্যাপক প্রভাবিত, ৩৩ শতাংশ মোটামুটি প্রভাবিত এবং ১১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন কম প্রভাবিত।

চিত্র ৬ : বাংলাদেশের উত্তরদাতাদের ৯০ শতাংশ যারা মনে করেন সরকার বিশেষ মহলের স্বার্থে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হয় তাদের মতামত (%)

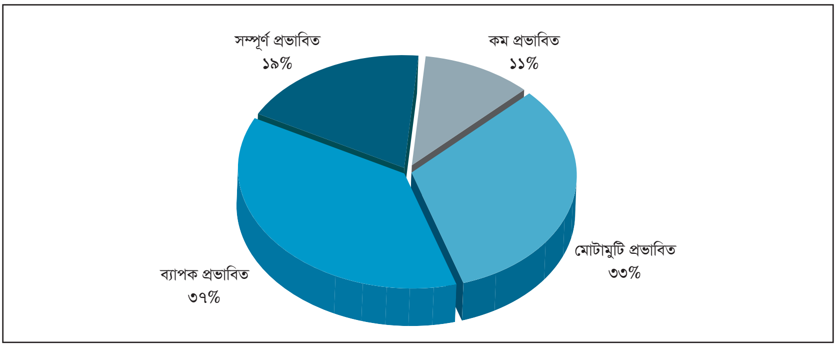

৩.১.৫ *সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত বা প্রতিষ্ঠান*

এই জরিপে উত্তরদাতাদের ধারণামতে ১২টি খাতে দুর্নীতির মাত্রা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। এ খাতগুলো হলো–রাজনৈতিক দল, সংসদ বা আইনসভা, সামরিক বাহিনী, এনজিও, গণমাধ্যম, ধর্মীয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বা বেসরকারি খাত, শিক্ষাব্যবস্থা, বিচার বিভাগ-আদালত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা, পুলিশ ও সরকারি প্রশাসন। নির্বাচিত খাত বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের শতকরা হার বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশে ৯৩ শতাংশ উত্তরদাতা রাজনৈতিক দল ও পুলিশকে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের একই জরিপে বাংলাদেশে উত্তরদাতারা সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে পুলিশকে চিহ্নিত করেন।

অপরদিকে বৈশ্বিক বিশ্লেষণে ৯৩ শতাংশ উত্তরদাতা রাজনৈতিক দল ও সরকারি প্রশাসনকে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পুলিশ ও সংসদ বা আইনসভা।

চিত্র ৭ : নির্বাচিত খাত বা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করেন এমন উত্তরদাতার শতকরা হার

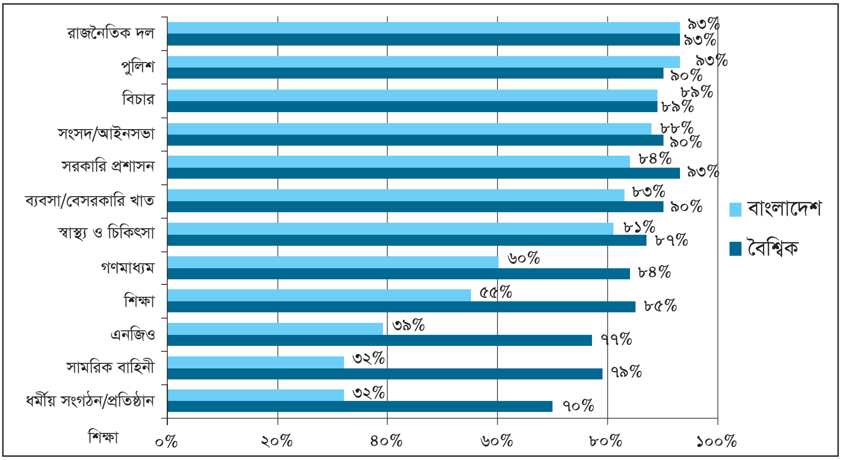

এই জরিপে নির্বাচিত খাত বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি উদ্বেগজনক (উদ্বেগজনক বলতে বেশ এবং খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত বোঝানো হয়েছে) বলে মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের হার বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের সর্বোচ্চ ৬৪ শতাংশ পুলিশ, ৫৩ শতাংশ বিচার ও ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা রাজনৈতিক দলকে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে বৈশ্বিক বিশ্লেষণে সর্বাধিক ৬৫ শতাংশ রাজনৈতিক দল, ৫৯ শতাংশ পুলিশ ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা সংসদ বা আইনসভা এবং সরকারি প্রশাসনকে চিহ্নিত করেন।

চিত্র ৮ : নির্বাচিত খাত বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি উদ্বেগজনক বলে মনে করেন এমন উত্তরদাতার শতকরা হার

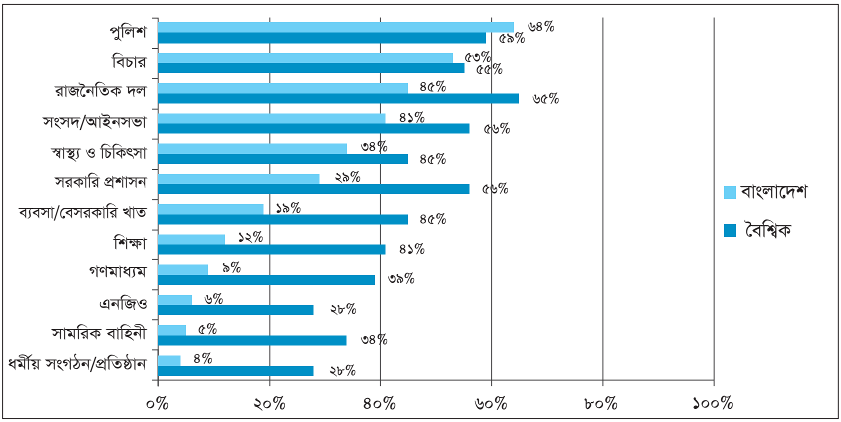

৪.১ দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার খানার অভিজ্ঞতা

৪.১.১ প্রতিষ্ঠান বা খাতসমূহে ঘুষের বিস্তার

জরিপে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি অথবা খানার অন্য কোনো সদস্য জরিপের পূর্ববর্তী ১২ মাসে উল্লিখিত আটটি সেবা খাতে সেবা নিতে গেছেন কি না বা যোগাযোগ করেছেন কি না এবং সেবা নিয়ে থাকলে ঘুষ দিতে হয়েছে কি না। এর উত্তরে দেখা যায় বাংলাদেশে পুলিশি সেবা নিয়েছেন ১১ শতাংশ খানা, যাদের মধ্যে ৭২ শতাংশকে ঘুষ দিতে হয়েছে, বিচারিক সেবা নেওয়ার হার ১৩ শতাংশ, যাদের ৬৩ শতাংশকে ঘুষ দিতে হয়েছে, ভূমিসংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন ২০ শতাংশ খানা, এদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন। রেজিস্ট্রেশন ও পারমিট সেবা নিয়েছেন ২৫ শতাংশ, এদের মধ্যে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন ৩৩ শতাংশ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থায় সেবা নিয়েছেন ৭৪ শতাংশ, যাদের ১৬ শতাংশ ঘুষ দিয়েছেন, শিক্ষাব্যবস্থায় সেবা নিয়েছেন ৭১ শতাংশ, এদের মধ্যে ১২ শতাংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন, ইউটিলিটিসে ৬০ শতাংশ সেবা নিয়েছেন, যাদের ১০ শতাংশ ঘুষ দিয়েছেন এবং ট্যাক্স বিষয়ে ৩৬ শতাংশ সেবা নিয়েছেন, যাদের ৮ শতাংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

চিত্র ৯ : সরকারি সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)।

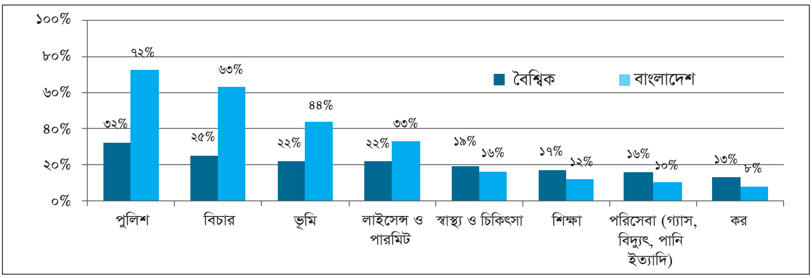

বৈশ্বিকভাবেও খানাগুলোর অভিজ্ঞতায় ঘুষ দেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি পুলিশ (৩২ শতাংশ), বিচার (২৫ শতাংশ) ও ভূমি (২২ শতাংশ) এবং লাইসেন্স ও পারমিট (২২ শতাংশ)। উল্লেখ্য, টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১২'-এর তথ্যের সাথে এ জরিপের বাংলাদেশ উপাত্তের ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওই জরিপে শীর্ষ ঘুষগ্রহীতা খাতগুলোর অন্যতম হিসেবে পুলিশ তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচারিক সেবা ও ভূমিসেবা চিহ্নিত হয়েছে।

চিত্র ১০ : সরকারি সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার : ২০১০ ও ২০১২-এর তুলনামূলক চিত্র (%)।

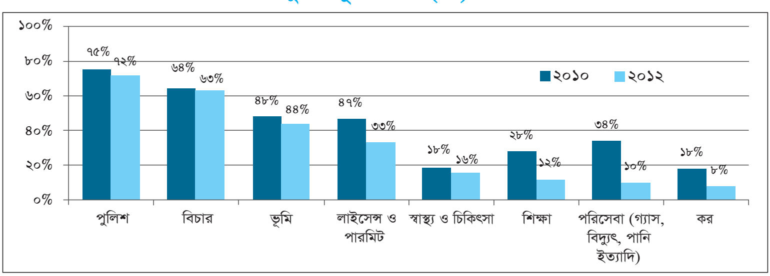

উল্লিখিত আটটি সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১০ ও ২০১২-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১০-এর তুলনায় ২০১২ সালে সবগুলো খাতেই ঘুষ দেওয়ার হার কমেছে। এ বিশ্লেষণটি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১২-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওই জরিপেও ২০১০-এর তুলনায় ২০১২ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার তুলনামূলক কমেছে।

বৈশ্বিকভাবে এই জরিপের পূর্ববর্তী এক বছরে উল্লিখিত আটটি সেবা খাতের কোনো না-কোনো একটিতে উত্তরদাতার খানার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার ২৮ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় জরিপে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর গড় হার ৩০ শতাংশ। আঞ্চলিক বিশ্লেষণে কোনো না-কোনো একটি খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি ভারতে ৫৪ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম মালদ্বীপে ৩ শতাংশ।

চিত্র ১১ : সরকারি সেবা গ্রহণে কোনো না-কোনো একটি সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার শতকরা হার।

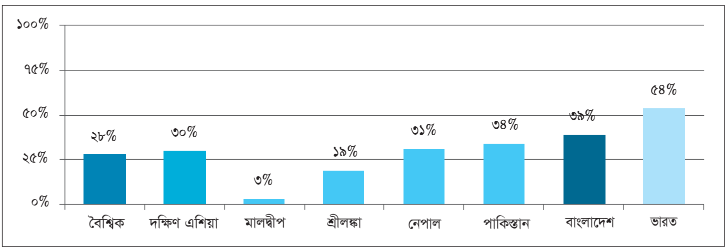

৪.১.২ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের সর্বাধিক ৫৮ শতাংশ সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র পথ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঘুষ দিয়েছেন ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা, উপঢৌকন হিসেবে বা খুশি হয়ে দিয়েছেন ৭ শতাংশ এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে সেবা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন উত্তরদাতাদের ৩ শতাংশ।

চিত্র ১২ : বাংলাদেশে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)।

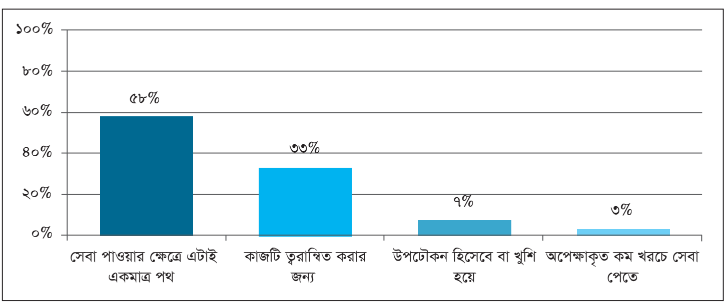

৪.১.৩ উত্তরদাতাদের কাছে কেউ কখনো ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ চেয়েছে কি না?

এ জরিপের উত্তরদাতাদের কাছে কেউ কখনো ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ চেয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের ৩৪ শতাংশ বলেছেন, তাদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ চাওয়া হয়েছে। বৈশ্বিকভাবেও এই ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ চাওয়ার হার ৩৪ শতাংশ। আঞ্চলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি ভারতে (৬৩ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম মালদ্বীপে (১৩ শতাংশ)। অপরদিকে উত্তরদাতার কাছে যদি কেউ কখনো ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ চেয়ে থাকে তাহলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেছেন কি না, তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে যাদের কাছে ঘুষ চাওয়া হয়েছিল তাদের ৫১ শতাংশ (ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ চাওয়ার হার ৩৪ শতাংশ) ঘুষ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বৈশ্বিকভাবে ঘুষ দেওয়ার অস্বীকৃতির হার ৬৬ শতাংশ। আঞ্চলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি মালদ্বীপে (৮৫ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম নেপালে (২৮ শতাংশ)।

৫.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম : জনগণের মতামত

৫.১.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকরতা

একটি দেশের সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং এ লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাংলাদেশ সরকারও ইতিমধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, উত্তরদাতা সুরক্ষা আইন ইত্যাদি। দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের এসব পদক্ষেপ কতটা কার্যকর তা উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জরিপে বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের সর্বাধিক ৪২ শতাংশ মনে করেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপগুলো কার্যকরও না আবার অকার্যকরও না, ২৬ শতাংশ মনে করেন পদক্ষেপগুলো কার্যকর এবং ৩২ শতাংশ মনে করেন অকার্যকর।

চিত্র ১৩ : দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকরতা (%)

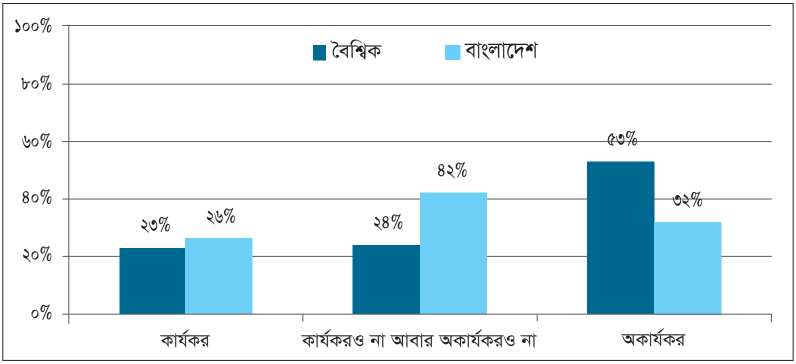

বৈশ্বিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপগুলোকে অকার্যকর বলে মনে করেন ৫৩ শতাংশ, কার্যকরও না আবার অকার্যকরও না মনে করেন ২৪ শতাংশ এবং কার্যকর মনে করেন ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

চিত্র ১৪ : ২০১০ ও ২০১২-এর জরিপে দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকরতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ (%)

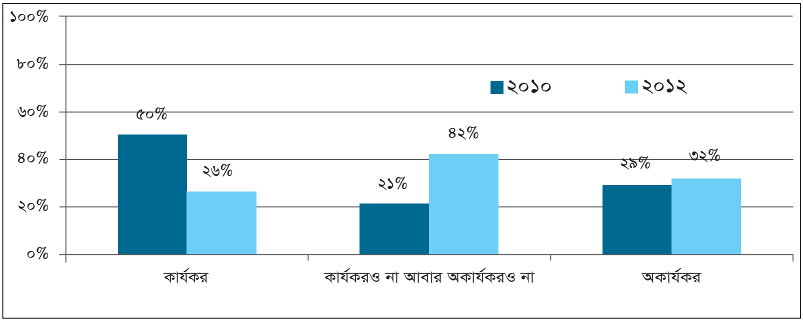

দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকরতার তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১০-এর তুলনায় ২০১২ সালে উত্তরদাতাদের ধারণা ক্রমশ নিম্নমুখী। ২০১২ সালে উত্তরদাতাদের ২৬ শতাংশ কার্যকর বলে মত প্রকাশ করেছেন, ২০১০ সালে এই হার ছিল ৫০ শতাংশ।

৫.১.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ

সাধারণভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের ভূমিকা বরাবরই কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হয়। 'সাধারণ জনগণ দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে'–এ ব্যাপারে উত্তরদাতারা একমত কি না, তা জানতে চাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশে ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, সাধারণ জনগণ দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে, বৈশ্বিকভাবে এই হার ৬৭ শতাংশ। আঞ্চলিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ ব্যাপারে উত্তরদাতাদের একমত হওয়ার হার বাংলাদেশে সর্বাধিক (৯২ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম ভারতে (৫৫ শতাংশ)।

চিত্র ১৫ : 'সাধারণ জনগণ দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে'- উত্তরদাতাদের মতামত (%)

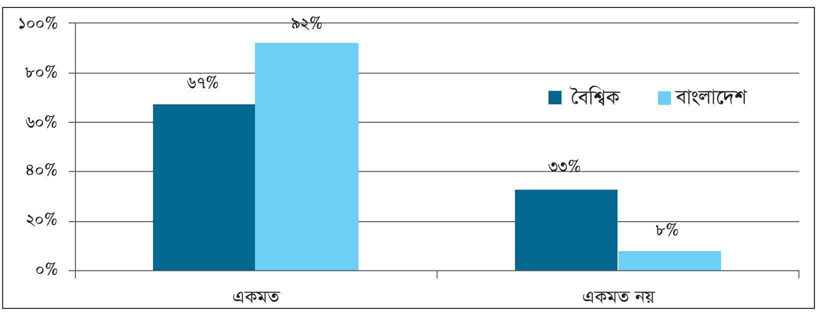

৫.১.৩ দুর্নীতির ঘটনা অবহিতকরণ

এ জরিপে দুর্নীতি সংঘটনের ঘটনা অবহিত করার আগ্রহের হার চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তরদাতার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে তার জানা মতে, কোথাও দুর্নীতির ঘটনা সংঘটিত হতে দেখলে তা রোধকল্পে তিনি জানাবেন কি না। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ৮৪ শতাংশ বলেছেন তারা দুর্নীতির ঘটনা জানাবেন। পরবর্তীতে তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় দুর্নীতির ঘটনা কোথায় জানাবেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বাধিক ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ স্থানীয় জনপ্রতিনিধির (সংসদ সদস্য, মেয়র, কাউন্সিলর, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ইত্যাদি) কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ সরাসরি দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ১১ দশমিক ৪ শতাংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণবিষয়ক প্রতিষ্ঠান–দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা হটলাইন, প্রভাবশালী ব্যক্তি ৯ দশমিক ৩ শতাংশ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৬ দশমিক ১ শতাংশ, গ্রাম আদালত ৫ দশমিক শূন্য শতাংশ, সংবাদমাধ্যম ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, স্বাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৬ দশমিক ৭ শতাংশ অন্যান্য (পরিবারের অন্যান্য সদস্য ৫ দশমিক শূন্য শতাংশ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ, ভালো লোক শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ) মাধ্যমের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ৫ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতা দুর্নীতির ঘটনা কোথায় অবহিত করবেন তা জানেন না।

চিত্র ১৬ : উত্তরদাতা দুর্নীতির ঘটনা কোথায় জানাবেন (%)

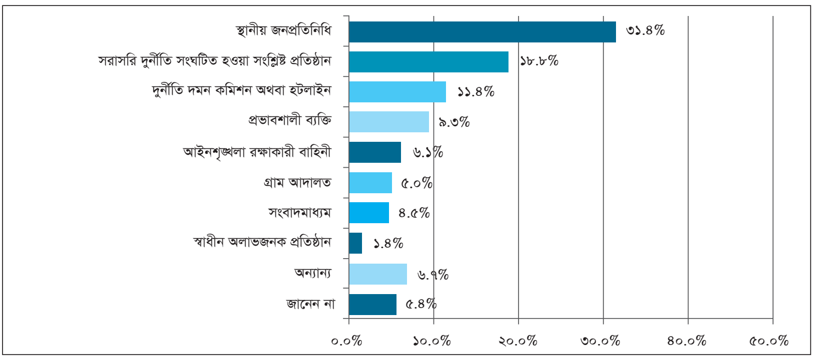

৫.১.৪ দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

এ জরিপে উত্তরদাতার কাছে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণের বিভিন্ন মাধ্যমের কথা উল্লেখ করে জানতে চাওয়া হয়েছিল এই মাধ্যমগুলোতে তিনি অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করবেন কি না। জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের শতভাগ কোনো না-কোনো মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। বৈশ্বিকভাবে এই হার ৬৯ শতাংশ। বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের ৯১ শতাংশ সরকারের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম আরও বেগবান করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণে আগ্রহী, ৮৫ শতাংশ শান্তিপূর্ণ দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ও সমাবেশে অংশগ্রহণে আগ্রহী, ৮১ শতাংশ দুর্নীতিবিরোধী সংগঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং ৭৯ শতাংশ দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি থেকে প্রয়োজনে বেশি মূল্যে পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

চিত্র ১৯ : দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী উত্তরদাতার হার

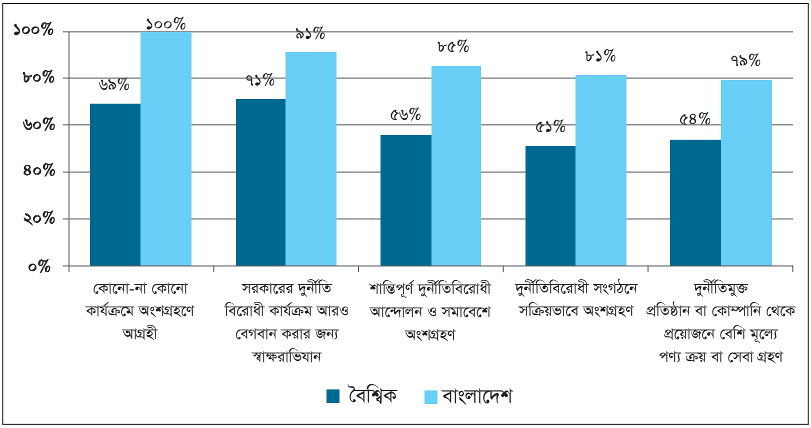

৬. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১২-এর বিশ্লেষণে অধিকাংশ উত্তরদাতার (৬০ শতাংশ) ধারণা মতে, বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে; কিন্তু উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দুর্নীতি কমেছে।
- এ জরিপে সরকারি খাতের দুর্নীতি একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উত্তরদাতাদের ধারণা মতে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা সর্বোচ্চ দুর্নীতিপ্রবণ খাত।
- অপরদিকে উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পুলিশ, বিচারব্যবস্থা ও ভূমি সেবা শীর্ষ ঘুষগ্রহীতা খাতগুলোর অন্যতম।
- এ ছাড়া ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সরকার বিশেষ মহলের (রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক, বিশেষ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ইত্যাদি) স্বার্থে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হয়।
- দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকরতার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ৩২ শতাংশ মনে করেন, সরকারি পদক্ষেপ অকার্যকর, যা ২০১০ সালে ছিল ২৯ শতাংশ।
- তবে আশার দিক হলো, বাংলাদেশে উত্তরদাতাদের ৯২ শতাংশ দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী এবং উত্তরদাতাদের শতভাগই কোনো না-কোনোভাবে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
- জরিপের উত্তরদাতাদের মতে, চূড়ান্ত বিবেচনায় সরকারের হাতেই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কার্যকর বাস্তবায়নই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হতে পারে।

৭. সুপারিশ

'গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার-২০১২' শীর্ষক জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল এবং টিআইবির কার্যক্রমের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালার প্রস্তাব করা হচ্ছে :

১. যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি, সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।
২. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে।
৩. প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৪. সরকারি ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১'-এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে পেশাদারত্বের সাথে কাজ করতে হবে।
৬. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।
৭. দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও কার্যকর করতে হবে। একইভাবে অন্য জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানগুলোকে (যেমন- সংসদ, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম ইত্যাদি) কার্যকর করতে হবে।
৮. গণমাধ্যমসহ সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

সর্বোপরি গণতন্ত্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে কাজে লাগাতে হবে, আর এ ব্যাপারে গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের যৌথ উদ্যোগ অপরিহার্য।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি*

শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস

১. ভূমিকা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ (পরবর্তী সময়ে শুধু সনদ ব্যবহৃত হবে) দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং আইনগতভাবে বাধ্যকরী একটি সর্বজনীন দলিল। দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন অধিকতর ফলপ্রসূ করতে এই সনদ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর সনদটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ৫৮/৪ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং একই বছরের ৯-১১ ডিসেম্বর মেক্সিকোর মেরিডায় অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে সনদটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরে ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বরে বলবৎ হয়। এটিই প্রথম আইনগত বাধ্যবাধকতাপূর্ণ একটি দুর্নীতিবিরোধী চুক্তি, যা এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য প্রযোজ্য। ২৯ মে ২০১৩ পর্যন্ত ১৪০টি দেশ ও সংস্থা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৬৭টি দেশ ও সংস্থা এই চুক্তির পক্ষভুক্ত হয়েছে।

সরকারের সাথে নাগরিক সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অ্যাডভোকেসি, ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্বগ্রহণকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দাবি ও ভূমিকার ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সনদের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতিবিরোধী নির্বাচনী অঙ্গীকার এ সনদ বাস্তবায়নে সুযোগ ও প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে।

সনদ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ যেমন- কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস (বিসিজিএ), অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যালোচনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সনদের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশকেও কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সনদ বাস্তবায়নে অপরিহার্য মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও কার্যকরতার অভাব, জনবলের ঘাটতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের ঘাটতি, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই ও মূল্যায়নের অভাব, সর্বোপরি আইনি সংস্কারের অভাবসহ নানা কারণে সনদ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সনদে অন্তর্ভুক্তির পরবর্তী সময়ে টিআইবি ২০০৭ ও ২০১০ সালে বাংলাদেশে এই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট প্রধান স্টেকহোল্ডারদের যেমন, বাংলাদেশ সরকার, ইউনাইটেড অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

* ২০১৩ সালের ৯ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত কার্যপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

(টিআই) সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেয়।[৭৩] সনদ বাস্তবায়নে নানা ধরনের অঙ্গীকার এবং কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হলেও এর নিয়মিত অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। টিআইবি এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১.১ কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে কার্যপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ, সাফল্য, ব্যর্থতা তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশের প্রস্তাব করা।

১.২ কার্যপত্র প্রণয়নপদ্ধতি

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের (আইন মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ) সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া ২০০৭ ও ২০১১ সালের প্যারালাল রিভিউ রিপোর্ট, সরকার কর্তৃক পূরণকৃত সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট, বিসিজিএ প্রতিবেদন, অ্যাকশন প্ল্যান, বিভিন্ন আইন, কৌশলপত্র, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদন ও টিআইবির বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। জুলাই ২০১২ থেকে মে ২০১৩ সময়কালে এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৩ কার্যপত্রের পরিধি

এই কার্যপত্রে সনদ বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদান যেমন–দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ, সম্পদ পুনরুদ্ধার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জের ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

২. সনদের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

সনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা, সম্পদের পুনরুদ্ধারসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জনসম্পদ ও সরকারি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহি ও সততা উন্নত করা। এই সনদ একদিকে যেমন দুর্নীতি প্রতিরোধে একমাত্র সর্বজনীন ও বহুমুখী অঙ্গীকার, তেমনি আবার যথেষ্ট নমনীয়ও, যাতে করে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আইনগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনায় আনা যায়। সনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোনো রাষ্ট্রপক্ষকে তার সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। এ

[৭৩] সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট ২০০৭ ও ২০১০ অনুযায়ী টিআইবি প্রতিবেদন তৈরি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে প্রেরণ করে।

ছাড়া সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ দেশে ঘুষ, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধক অবকাঠামো আরও সমৃদ্ধ করার অঙ্গীকার করে। এই সনদে অনুসমর্থনের ফলে রাষ্ট্র সরকারি-বেসরকারি খাতে দুর্নীতি রোধে নিজস্ব সম্পদ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সর্বোপরি এই সনদ অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকরতার সাথে দুর্নীতিরোধে শক্তিশালী পন্থা উদ্ভাবনে রাষ্ট্রগুলোকে উৎসাহিত করে।

৩. সনদের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

২০০৫ সালে সনদ কার্যকর হওয়ার পরপরই এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য 'সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন' (সিওএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলন ৩/১ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে একটি 'স্বচ্ছ, কার্যকর, অনাহূত প্রবেশমূলক নয় (নন-ইনট্রুসিভ), এবং নিরপেক্ষ' পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (রিভিউ মেকানিজম) গ্রহণ করে এবং দুটি পাঁচ বছরমেয়াদি পর্যালোচনা চক্রের বিষয়ে একমত হয়। সব সদস্যরাষ্ট্র সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট পূরণ করে তা সম্মেলন সচিবালয়ে পাঠাবে। এ ছাড়া একটি সদস্যরাষ্ট্রকে অন্য দুটি পৃথক সদস্যরাষ্ট্র পর্যালোচনা করবে এবং এই পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই রাষ্ট্রটি তাদের মতামত গ্রহণ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সচিবালয় পর্যালোচিত দেশের সফলতা, চ্যালেঞ্জ, পর্যবেক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তার দিকগুলো তুলে ধরবে। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য এর প্রতিটি স্তরে এবং সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

৪. সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

২০০৭ সালে সনদে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে বাংলাদেশ সরকার সনদ বাস্তবায়নে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ যেমন, বিচার বিভাগ পৃথককরণ, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গঠন ইত্যাদি গ্রহণ করে। এ ছাড়া সনদের পক্ষভুক্ত কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস সম্পন্ন করে। ২০০৯ সালে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সনদ বাস্তবায়নের জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সরকার ২০১১ সালে সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট নির্ধারিত সময়ে পূরণ করে তা জমা দেয় এবং টিআইবিকে পরিপূরক বা ছায়া প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা করে। ইরান ও প্যারাগুয়ের সদস্য এবং ইউএনওডিসির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পিয়ার রিভিউ টিম ২০১১ সালে বাংলাদেশ পরিদর্শন করে এবং সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশের সেলফ-অ্যাসেসমেন্টের ওপর পারস্পরিক মতবিনিময় করে। এ ছাড়া এ সনদের অধীনে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ (সেন্ট্রাল অথরিটি) হিসেবে মনোনীত করা হয়। পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা কার্যকর করার জন্য বহিঃসমর্পণ আইন ও বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক জোরদার করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সনদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সাথে দেশীয় আইন অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া সরকার সনদের সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আইন ২০০৯, ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন ২০০৯, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) প্রদান আইন ২০১১, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, অপরাধ-সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ প্রণয়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ সংশোধন ও সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৫. কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা

২০০৮ সালের জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলনে সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস উপস্থাপিত হয়। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী আইন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত দুর্বলতা ও ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের কথা বলা হয়। সনদ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হলেও বাস্তবে এটাকে অনুসরণ করে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। যেমন, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইনি বিধানের প্রবর্তন, বিদেশে পলাতক আসামিকে দেশে ফিরিয়ে আনাবিষয়ক আইন পর্যালোচনা, পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার জন্য আইনগত ভিত্তি প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। অন্যদিকে দুর্নীতি দমন আইনের পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ পর্যালোচনা, সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন, সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, জবাবদিহির চর্চা এবং তদারকির ভূমিকা পালন, জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নাগরিক সমাজ ও সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণসহ আরও কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। এ ছাড়া কর্মপরিকল্পনার অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অনেক কার্যক্রমই ওই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়নি।

৬. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সনদ বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ

৬.১ দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ

সনদে দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন, সদস্য রাষ্ট্রের দুর্নীতি রোধে কার্যক্রম গ্রহণ, দুর্নীতি-সংক্রান্ত আইনের মূল্যায়ন এবং দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সনদে দুর্নীতি প্রতিরোধক সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রধান কার্যক্রম, ওই সংস্থার স্বাধীনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর [৫(১), ৫(২), ৫(৩), ৫(৪), ৬(১), ৬(২)] সাথে বাংলাদেশের সামঞ্জস্যবিধানকারী আইনগুলো হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭, দণ্ডবিধি ১৮৬০ ও ফৌজদারি

কার্যবিধি আইন (সংশোধন) ১৯৫৮। বর্তমান সরকার দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২' এবং 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন ২০১১' প্রণয়ন করে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। এ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে সম্প্রতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য-প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য ২০০৪ সালে একটি স্বাধীন, স্বশাসিত ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দুদককে স্বাধীন ও কার্যকর করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচনী অঙ্গীকার। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুদক স্বাধীন ও কার্যকরভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে দুদক কিছুটা কার্যকর হলেও এর অনেক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ২০০৯ সালে দুদক পুনর্গঠিত হওয়ার পরও তাদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি পদ্মা সেতুর ইস্যুতে বিশ্বব্যাংকের কঠোর অবস্থান গ্রহণের সাথে সাথে সরকারের অবস্থান পরিবর্তন এবং দুদকের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই সাথে পরিবর্তন প্রমাণ করে যে দুদক এখনো একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে ২০১০ সালের ২৬ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের সভায় 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪'-এর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবিত সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে কমিশনের সব কাজে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আইনগতভাবে দুদক সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং দুদকের ক্ষমতা খর্ব হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবিসহ বিভিন্ন অংশীজনের প্রতিবাদ ও দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির পর এটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হলেও দুদক বা অন্য কোনো অংশীজনকে কোনোভাবে সম্পৃক্ত না করেই উল্লিখিত সংশোধনী আবার অনুমোদন করা হয়, যদিও আইনটি এখনো সংসদে পাস হয়নি।[৭৪]

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুদকে জনবলের ঘাটতি ছিল। দুদককে কার্যকর করতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের খুব বেশি তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। বর্তমানে দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১ হাজার ৭৩ জন। এ ছাড়া কমিশনের আইনগত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এই প্যানেল আইনজীবীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে দুদকের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সময় থেকে বহাল আছেন, যাদের কর্ম-ইতিহাস যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঢালাওভাবে দুদকে আত্তীকরণ করা হয়। এর ফলে দুদকের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধান ও তদন্ত ছাড়াও দুদক সারা দেশে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রায় ৪৫০টি দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং প্রায় ১২ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা সংঘ (ইন্টিগ্রিটি ইউনিট) গঠন করেছে। এ ছাড়া দুদক দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন, সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালিসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ

৭৪ ইফতেখারুজ্জামান, 'টিআইবি কি ম্রিয়মাণ?', দৈনিক আমার দেশ, ১৬ জুলাই ২০১২।

করে। দুদক তাদের কার্যক্রম সহজীকরণের নিমিত্তে ডিজিটাইজেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে এখন কমিশনের ই-মেইলে অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে।[৭৫] দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টিআইবির ২০১২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে কোনো না-কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[৭৬] এ ছাড়া দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি না করা, আইনি সংস্কারের মাধ্যমে দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা খারিজ এবং কালোটাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখার মতো পদক্ষেপগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধের পথে অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

৬.২ অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ

সনদের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ থেকে ৪২ অনুচ্ছেদে দেশীয় ও বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণ, সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপব্যবহার বা অন্যান্য স্থানান্তর, প্রভাব বাণিজ্য, কর্তব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ উপার্জন বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে বেসরকারি খাতে ঘুষ গ্রহণ, সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের পাচার, গোপন করা, ন্যায় বিচারের প্রতিবন্ধকতা এবং আইনগত ব্যক্তির দায়ভার। এখানে আইন বলবৎকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা [অনুচ্ছেদ ৩৭], জাতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সহযোগিতা [অনুচ্ছেদ ৩৮] এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি খাতের মধ্যকার সহযোগিতার বিষয়েও [অনুচ্ছেদ ৩৯] বলা হয়েছে।

সনদের অপরাধ দমন ও আইনের প্রয়োগ-সংক্রান্ত অধিকাংশ অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাংলাদেশের আইনগুলো হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭, দণ্ডবিধি ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি আইন (সংশোধন) ১৯৫৮ ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২। অন্যদিকে বাংলাদেশে বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী ও আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণের অপরাধ-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ২ ধারায় বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপরাধ সংঘটনকারী যেকোনো ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। এই আইনের আওতায় সীমিত আকারে বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী ও আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণের মামলাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ ছাড়া জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ৩২ অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতি বিধান করার জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা বিষয়ে আইন প্রণয়নের বিষয়টি আলোচনাধীন থাকলেও এখনো প্রণীত হয়নি।

দুর্নীতির মামলার যথাযথ নথিবদ্ধকরণের অভাব, তথ্য প্রাপ্তির অপ্রতুলতা এবং তথ্যের হালনাগাদকরণের অভাব আইন বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করছে। দুদকের জানুয়ারি ২০০৭ থেকে

[৭৫] *ত্রৈমাসিক দুদক দর্পণ*, জুলাই ২০১২।

[৭৬] এ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য প্রাক্কলনে দেখা যায়, বাংলাদেশের খানাগুলো জরিপকৃত সেবা খাতে বছরে প্রায় ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ এবং জিডিপির ২ দশমিক ৪ শতাংশ।

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বছরভিত্তিক সম্পদের বিবরণী নোটিশ জারি, অনুসন্ধান, নথিভুক্ত, এফআইআর, সিএস ও এফআরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুদক ৬৮১টি সম্পদের বিবরণী নোটিশ জারি করেছে, ৬ হাজার ৭০২টি অনুসন্ধান করেছে, ৩ হাজার ৭৪টি এফআইআর বা মামলা দায়ের করেছে, ২ হাজার ৭৮২টি মামলার চার্জশিট এবং ১ হাজার ৫০৫টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে দুদকের বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২ হাজার ১১৮টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৭২০টি মামলার বিচার চলমান অবস্থায় আছে এবং ৪০১টি মামলার বিচার স্থগিত আছে। অপরদিকে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩১টি, যার মধ্যে ৪২টি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সাজা হয়েছে এবং ৮৯টি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পেয়েছে। পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ১,২৩২টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বাংলাদেশে অপরাধ নির্ধারণ ও আইন প্রয়োগ করে মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দুদক। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে এসব প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করে। এ লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং এসব সংস্থায় নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। ফলে অপরাধ দমনে আইনের সঠিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে না (টিআইবি, ২০১২)।

৬.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সনদে বলা হয়েছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ–এ কথা স্মরণ রেখে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র তার আইন ব্যবস্থার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করে, বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সব সদস্যের মধ্যে সততা বৃদ্ধি এবং তারা যাতে দুর্নীতি করার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করবে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে বিচার বিভাগের সদস্যদের জন্য প্রণীত আচরণবিধিও অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গগুলো থেকে বিচার বিভাগের পৃথককরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া সংবিধানে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৭৭]

[৭৭] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ জানুয়ারি ২০০৯। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এবং ব্রিটিশ কমিশনারের সাথে এক সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের বিচার বিভাগ এখন নিজস্ব গতিতে চলবে। সরকার তাতে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না।’

ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ নিরসন ও বিচার ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও নতুনত্ব আনার জন্য সরকার ও বিচার বিভাগ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথককরণের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ, অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন ও তা কার্যকর করা, প্রধান বিচারপতির সম্পদের বিবরণী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ এবং অন্যান্য বিচারপতির সম্পদের বিবরণী প্রদানের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক বিচারপতির সম্পদের বিবরণী প্রধান বিচারপতির কাছে প্রদান, সুপ্রিম কোর্টে মামলা আদালতে তুলতে এবং আদেশের কপি ও নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় না পাঠিয়ে কারসাজি করাসহ বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জামিনজনিত দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন উল্লেখযোগ্য।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও নিম্ন আদালতের ওপর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব রয়ে গেছে। একইভাবে উচ্চ আদালতে নিয়োগ-পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। উচ্চ আদালতে নিয়োগ-সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। এ ছাড়া এখনো বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করা হয়নি এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জনবল ও যানবাহন-ব্যবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায়নি। এর বাইরেও নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, বিভাগীয় নানা সুবিধা নিয়ে তদবির করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে জামিন দেওয়া কিংবা না দেওয়া, রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা বা না করা ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ পাওয়া যায়।

৬.৪ সম্পদ পুনরুদ্ধার

সম্পত্তির হিসাব বিবরণী সনদের একটি মূলনীতি এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ একে অপরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ৫১]। অপরাধের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি হস্তান্তর প্রতিরোধ ও শনাক্তকরণ বিষয়ে সনদে বিস্তারিত বিবরণ আছে [অনুচ্ছেদ ৫২]। সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা [অনুচ্ছেদ ৫৩], বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার [অনুচ্ছেদ ৫৪] এবং বাজেয়াপ্তকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা [অনুচ্ছেদ ৫৫] সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া বিশেষ সহযোগিতা, সম্পত্তি ফেরত এবং বণ্টন, আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ও দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তি এবং বন্দোবস্ত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে [অনুচ্ছেদ ৫৬, ৫৭, ৫৮ ও ৫৯]।

সনদের এই অনুচ্ছেদগুলোর সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশীয় আইন হচ্ছে– মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, অপরাধ-সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২, ফৌজদারি কার্যবিধি আইন (সংশোধন) ১৯৫৮, সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন ২০১২, সরকারি কর্মচারী (আচরণ)

বিধিমালা ১৯৭৯, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭, দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮। এ ছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে প্রদত্ত নোটিফিকেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, গাইডেন্স নোট ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ উদ্ধারের বিষয়ে বিস্তারিত আইনি কাঠামো রয়েছে।

বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সম্পত্তির পুনরুদ্ধার-সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। সনদের এই বিধানগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনটিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম ২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যদিকে জাতিসংঘ সনদের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ মানি লন্ডারিং ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবিরোধী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং আর্থিক সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য জাতীয় কৌশল ২০১১-১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ ছাড়া সম্প্রতি অপরাধ-সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ প্রণীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অপরাধমূলক কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি ফ্রিজ বা আটক-সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান বা গ্রহণে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ দশটি দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা চুক্তি করেছে। এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর হলে জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত না করে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য দেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরোধ বা তথ্য প্রদান করতে পারবে। এ ছাড়া ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি বা স্মারকপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম উন্নত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তবে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পরিবীক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কিছু প্রযুক্তিগত দুর্বলতা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৪)।

সম্পদ উদ্ধার প্রক্রিয়াটি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। বাংলাদেশেও বিভিন্ন আইনি ও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির খুবই কম। বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা একটি কঠিন আইনি লড়াই। কারণ টাকাটা যে পাচারকৃত তা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। এ ছাড়া অন্য দেশের সরকারকে পাচারকৃত টাকার খোঁজ দিতে রাজি করানোও একটি কঠিন কাজ। তবে সম্প্রতি প্রথমবার পাচারকৃত ১৩ কোটি টাকা সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত এসেছে। এই আইন অনুযায়ী দুদক মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত মামলা তদন্ত ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী বিচারিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে দুদক ইতিমধ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসহ বেশ কিছু মামলা দায়ের করেছে। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক কিছু সংখ্যক তদন্ত শুরু হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পদের খোঁজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছিল। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এই কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে।

৬.৫ রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

সনদে সরকারি পদে প্রার্থিতা ও নির্বাচনের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। দেশীয় আইন সনদের এসব শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি আইনসভা থাকবে এবং সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হবে। সংবিধানে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণের আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর।

রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সরাসরি সম্পৃক্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯' অনুসারে প্রধানত রাজনৈতিক অনুদান গ্রহণ ও নির্বাচনে ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে রাজনৈতিক অর্থায়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এসব আইনে দল ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আর্থিক অনুদান-সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয়নি। গণমাধ্যম ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোও রাজনৈতিক অনুদান-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। তবে দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সব তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। ২০০৭ সালে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে অবাধ ও মুক্ত করতে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে নির্বাচন কমিশন আচরণবিধিমালা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করেনি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সাংবিধানিক ম্যান্ডেট এবং সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও কমিশন এসব রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে খুব সামান্যই পদক্ষেপ নিতে পারছে। প্রকৃতপক্ষে এ-সংক্রান্ত অনেক আইন হলেও সেগুলো বাস্তবায়নে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

৭. সনদ বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

সনদের ১৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র তার সামর্থ্যের মধ্যে এবং দেশীয় আইনের মৌলিক নীতিগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি ক্ষেত্রের বাইরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং দুর্নীতির অস্তিত্ব, কারণ ও গভীর ক্ষতিকারক ফলাফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যক্তি বা দলগত পর্যায়ে নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংস্থা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, বিশেষ করে টিআইবির অ্যাডভোকেসির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সনদের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র হয়। এ ছাড়া তথ্য অধিকার আইন ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন অনুমোদন, 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন' প্রণয়নসহ নানা আইনি সংস্কারের পেছনে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। একইভাবে তাদের দাবির অংশ হিসেবে দেশে মানবাধিকার কমিশন এবং তথ্য কমিশনও

গঠিত হয়। সনদে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে টিআইবিসহ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এবং গণমাধ্যম সনদ বাস্তবায়নে সরকারের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এসব ভূমিকার মধ্যে কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ, সনদ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণা, সনদ বাস্তবায়নের ওপর ছায়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি। তবে নাগরিক সমাজ ও একাধিক বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ, কর্মপরিকল্পনা বা প্রচারণা থাকলেও মুষ্টিমেয় কিছু ইতিবাচক দৃষ্টান্ত ছাড়া সরকারের দিক থেকে নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করে কাজ করার মানসিকতায় এখনো ঘাটতি রয়েছে।

৮. সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ঘাটতির প্রধান কারণ

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট ও বিশদ দেশীয় আইন রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারও রয়েছে। তার পরও এসব আইন, অঙ্গীকার বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারার পেছনে রয়েছে নিম্নলিখিত কারণ :

- **দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা ও প্রভাব :** দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা অব্যাহতির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সততা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেয় না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সর্বদা ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিলের ঘটনায় এর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দিক থেকে অনুসন্ধানে ঘাটতি দেখা যায় এবং তাকে রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত আশ্রয় দেওয়া হয়।
- **দুদকের কার্যকরতার অভাব :** দুদকের এখতিয়ারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। এ ছাড়া দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণবিধি না থাকা এবং তাদের দক্ষতা ও সততার ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়গুলো দুদক ও তদন্তের সামর্থ্যের অকার্যকরতা প্রকাশ করে। এ ছাড়া সরকার আইনি সংস্কারের মাধ্যমে দুদককে একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি :** দেশের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে জনবলের ঘাটতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের ঘাটতি রয়েছে, যা আইন প্রয়োগ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সামর্থ্যকে দুর্বল করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের সামর্থ্য নিশ্চিত না করার জন্য সরকার সমালোচিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর (সুরক্ষা) প্রদান আইন প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলেও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। সরকার ন্যায়পাল-সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়নি; বরং অকার্যকর ভূমিকার অজুহাতে কর ন্যায়পাল বিলুপ্ত করা হয়েছে।

- **তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি :** সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যের প্রাপ্যতা সীমিত। এ ছাড়া তথ্য সরবরাহকারীর সক্ষমতারও অভাব লক্ষ করা যায়। সরকারি তথ্য প্রদানে গররাজি থাকার পেছনে রয়েছে সরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তার সংস্কৃতি।
- **সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও সচেতনতার অভাব :** সনদে অন্তর্ভুক্তির পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও এ সম্পর্কে প্রচারণা ও জনসচেতনতার অভাব রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পর্যায়েও এ-সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া সনদ বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অন্তঃ ও আন্তসম্পর্কীয় সমন্বয়ের অভাব।
- **ফোকাল পয়েন্টের কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সক্রিয়তা ও সক্ষমতার ঘাটতি :** সনদে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে আইন প্রণয়ন ও সংসদবিষয়ক বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিক ও প্রযুক্তিগত ঘাটতি রয়েছে। তথ্যের আদান-প্রদান, সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি, সনদ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ তথা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ তার জন্য অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।
- **সুশীল সমাজের ভূমিকা পালনে সরকারের অনাগ্রহ :** দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশীল সমাজকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার পরিবর্তে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে অনেক ক্ষেত্রেই অনাগ্রহ ও অসহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৯. উপসংহার ও সুপারিশ

সনদের সফল বাস্তবায়ন হলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি সর্বোপরি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বলে টিআইবি মনে করে।

ক. দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ

১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও কার্যকর করতে হবে, এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এটিকে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিতে হবে।

২. সংসদে বিবেচনাধীন খসড়া সংশোধনী আইনটি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে অনতিবিলম্বে অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশনকে তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, সকল পর্যায়ের কর্মী নিয়োগ এবং বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানের বাজেটকে সরকারের দায়যুক্ত তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. বিচার বিভাগ স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ

৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনগণকে সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার প্রদান এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করতে হবে।

৬. সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

৭. বিচারিক সেবার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার বিভাগের সব স্তরে বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে। বিচারক ও আইনজীবীরা আচরণবিধি ভঙ্গ করলে যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ায় সংশোধন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা

৮. প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন হিসেবে স্বচ্ছ ও সুসংগঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

৯. গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোকে গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে দলীয় সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা, উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জনগণের জন্য আর্থিক তথ্য সহজলভ্য করতে হবে।

১০. রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আইন অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ. অর্থ পাচার প্রতিরোধ এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারে কার্যকরের উদ্যোগ গ্রহণ

১১. অর্থ পাচার প্রতিরোধ এবং পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।

১৩. পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা, বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল অপরাধ শনাক্তকরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ সম্পর্ক উন্নয়নে সরকারের সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

ঙ. সনদ বাস্তবায়নে আইন প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ :

১৪. সনদের সাথে সঙ্গতি বিধান করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের সংস্কার করতে হবে।

১৫. সনদ বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

১৬. সনদের কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিসটিকে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হালনাগাদ করতে হবে।

১৭. সনদ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

চ. সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা বৃদ্ধি :

১৮. পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার সুবিধাগুলো স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।

১৯. সনদের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক তৈরি করতে হবে।

২০. অন্য সদস্যরাষ্ট্রের অনুরোধকে সম্মান জানানোর জন্য প্রথমে তাদের নিজেদের দেশের আইনকে সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

ছ. সনদ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় ও ফোকাল পয়েন্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি :

২১. সনদ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্তঃ ও আন্তমন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ও জোরদার করতে হবে।

২২. সরকারি কর্মকর্তাদের সনদ ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৩. ফোকাল পয়েন্টের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

জ. সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি :

২৪. সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সনদের সাথে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ জনগণের কাছে সহজলভ্য করতে হবে।

২৫. সনদ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে জনগণ ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝ. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার :

২৬. সনদ বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক।

২৭. জাতীয় সততা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকরাম, শাহজাদা এম ও সাধন কুমার দাস (২০১০), *'নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা'*, ঢাকা : টিআইবি।

ইউএনওডিসি, *'জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ'*।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১০।

নীতি গবেষণা কেন্দ্র (২০১০), *'জুডিশিয়ারি ইন বাংলাদেশ : রিভিউ ২০০৯'*।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ : দিনবদলের সনদ।

শারমিন, রুমানা, ফাতেমা আফরোজ, সাধন কুমার দাস, শাহজাদা এম আকরাম (২০১২), 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি : অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ', ঢাকা : টিআইবি।

আকরাম, শাহজাদা এম. এবং অন্যান্য (২০১২) *'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ'*, ঢাকা : টিআইবি।

Akram, Shahzada M, Shadhan Kumar Das, and Tanvir Mahmud (2010) *'Political Financing in Bangladesh',* Dhaka: TIB.

Dell, Gillian (2011) *'The first year of the UN Convention against Corruption Review Process: A Civil Society Perspective',* Berlin: Transparency International and UNCAC Coalition.

Government of Bangladesh (2008) 'UNCAC – A Bangladesh Compliance and Gap Analysis', Dhaka.

Government of Bangladesh (2009) '*UNCAC – A Bangladesh Action Plan for Compliance',* Dhaka:

Iftekharuzzaman, 'The UN Convention against Corruption: Implications for Bangladesh What Next?', Transparency International Bangladesh, 9 December 2007; (http://www.tibangladesh.org/Documents/UNCAC-IACD07.pdf).

Zaman, Iftekhar, Shadhan Kumar Das, and Shammi Laila Islam (2011) *"UN Convention Against Corruption Civil Society Review: Bangladesh 2011",* Dhaka: TIB.

লেখক পরিচিতি

মোহাম্মদ নূরে আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ সাউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল শ্রীলংকায় বছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। নূরে আলম ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সংসদ এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

ফাতেমা আফরোজ

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি।

মো. শাহ্নূর রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ২০০৫ সাল থেকে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে বছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান, ঔষধ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য, পাসপোর্ট সেবা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

শাম্মী লায়লা ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সততা ব্যবস্থা, আইনি ও প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ ও এর প্রয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ), তথ্য অধিকার এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত (বন্দর ও কাস্টমস হাউস)।

তাসলিমা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

দিপু রায়

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মো. রেযাউল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সততা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাহী বিভাগ), গণপরিবহন খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন অ্যাকাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততা ব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

সাধন কুমার দাস

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন এবং দি হেগের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ থেকে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের ওপর স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী কাঠামো ও কৌশল, জাতীয় সততা ব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি ফ্রিয়েডরিখ-এবার্ট-স্টিফটুং বাংলাদেশে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কর্মরত।

রুমানা শারমিন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষা খাত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্মকমিশন নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়নাধীন এটুআই প্রকল্পে কর্মরত।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও এর ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিয়ে ‘বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক তিনটি সংকলন ইতিমধ্যে ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ সংকলন ২০১৬ সালের একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।

9 7 8 - 9 8 4 - 3 4 - 0 1 8 8 - 5